182.Oc.924.90.

সফুরার পরিণাম !

(সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস)

মৌলবী মোহাম্মদ রহমত উল্লা

প্রণীত।

(46)

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য ১।০ বাঁধাই ১॥০

182.Oc.924.90.

সফুরার পরিণাম !

(সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস)

মৌলবী মোহাম্মদ রহমত উল্লা

প্রণীত।

(46)

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য ১৷০ বাঁধাই ১৷৷০

প্রকাশক—
মোহাম্মদ নাজির উদ্দিন বিশ্বাস
সাং কৃষ্ণপুর, পোঃ কালিয়াচক, মালদহ।

IMPERIAL LIBRARY
18.3.26.

মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ কর্ত্তৃক
কলিকাতা ২৯নং আপার সারকুলার রোড,
মোহাম্মদী প্রেস হইতে মুদ্রিত।

উপহার পৃষ্ঠা।

এই গ্রন্থখানি

আমার

....

....কে

....

....

প্রদত্ত হইল।

তারিখ...................(স্বাক্ষর)..............................

....

....

নিবেদন।

বিশ্ব-প্রভু করুণাময় আল্লাহতায়ালার অনুকম্পায় **"সফুরার পরিণাম"** জনসমাজে প্রকাশিত হইল। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত নহে। উপাখ্যানের নায়ক আমাদের বন্ধুস্থানীয় লোক—তাহার নিকট যাহা শুনিয়াছি এবং ঘটনাকালাবধি সে স্থানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছি ও করিয়াছি তাহারই সারাংশ গ্রহণে ইহা লিখিত হইল সুতরাং পাঠক পাঠিকাগণ যেন মনে না করেন যে ইহা সম্পূর্ণই সামান্য কল্পনামাত্র।

পুস্তিকাখানি সমাজে আদৃত হইবে কিনা তাহা বলিতে পারি না, তবে অত্র পুস্তিকাখানি কোন একজন পাঠক বা পাঠিকার কথঞ্চিৎ প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিলেও শ্রম ও অর্থব্যয় সফল বলিয়া জ্ঞান করিব। পরিশেষে ইহাও স্বীকার্য্য যে বহু যত্ন ও চেষ্টা সত্বেও পুস্তিকার অনেক স্থানে অনেক দোষ থাকিয়া গেল। আশা করি সমাজ স্নেহের চক্ষে অধমাধম নগণ্য লিখকের প্রথম অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যদি জীবনে কুলায় এবং এই "সফুরার পরিণাম"এর ইহাই পরিণাম না হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সুযোগ হয় তাহা হইলে সে দোষ সমুহ সংশোধনে চেষ্টা পাইব। ইতি—

চকসেহের্দ্দি, পোঃ কালিয়াচক
মালদহ।
হিঃ ১৩৪৩। ৭ই মহরম।

বিনয়াবনত
মোহাম্মদ রহমত উল্লা।

সক্কুরার পরিণাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তখন ত্রিযামার দ্বিযাম অতীত হইয়াছিল। তিথির পরিভোগে শুক্ল চতুর্দ্দশীর শশধর মেঘহীন শান্ত সুন্দর পশ্চিম আকাশ হইতে শুভ্র হাঁসি ঢালিয়া ধরাতল প্লাবিত করিতেছিল। নৈশ-সমীর অমলচন্দ্রের বিমল কৌমুদী ঈষৎ-বিকম্পিত করিয়া মন্দমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল এবং তাহার সুস্নিগ্ধকর সংস্পর্শে ফল ফুল, লতা পাতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, পরম কারুণিক স্রষ্টার অনন্ত মহিমা জ্ঞাপন করিতে ছিল। জীবাজীবাধারে জীববর্গের কণ্ঠরব মোটেই শ্রুতিগোচর হইতে ছিল না; তবে বহুদূরে একটী পাপীয়া শাখী শাখে বসিয়া স্বীয় স্বাধীন মুক্ত-জীবনের আনন্দধ্বনিতে গগনতল ধ্বনিত করিয়া তুলিতে ছিল। এই আনন্দ দায়িনী প্রকৃতির মোহনদৃশ্য মধ্যে একটী যুবা তাহাজ্জুদের নামাজ পাঠান্তে বলিতেছিলেন;—

"দয়াময়! তুমি সর্ব্বহর্ত্তা, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বমঙ্গল বিধায়ক। তোমার মহিমা অপার লীলা বিচিত্র। বিধায় প্রশংসামাত্রই তোমার। ইচ্ছাময়! তুমি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পার! তোমার অপার

কি আছে বিভো! যে যার প্রত্যাশা, যাতে যার সুখ শান্তি, যাকে যে ভাল বাসে, যাকে বুকে করিলে যার অন্তঃরের জ্বালা হৃদয়ের তাপ বিদুরিত হইয়া অন্তঃকরণ সুশীতল হয় তাহা ত দিতে ত্রুটী করিতেছনা; কিন্তু ইচ্ছাময় করুণা নিদান! গোলামের করুণ প্রার্থনার প্রতি কেনই যে তোমার কৃপা কটাক্ষপাত হইতেছে না তাহা এ অবোধকে বুঝাইয়া দাও।

দীনবন্ধো! গোলামকে যখন সংসারী করিয়াছ তবে যাহাকে লইয়া সংসার-সংসারের যে সার-সংসার ধর্ম্মের যে দৃঢ় বন্ধন তাহা অমন হইল কেন? কোন অপরাধে এত বিড়ম্বনা দীননাথ! জন্মাবধি যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি—যে প্রকার অসহনীয় জ্বালা বুকে করিয়া জীবন ভার বহন করিতেছি তাহাকি দেখিতেছ না দীনপালক!

প্রভো! শুনিয়াছি তোমার দ্বারে হাত পাতিয়া যে যাহা ভিক্ষা করে তুমি তাহাকে সেই ভিক্ষাই দিয়া থাক এবং তুমি মানবের প্রতিও সেই আদেশ করিয়াছ, তবে হে রহমান রহিম! গোলামের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না কেন? প্রভো! গোলাম কি তোমায় ডাকিতে জানে না অথবা তাহার ভিক্ষা করা ঠিক হইতেছে না—যদি তাহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিয়া দাও এ আজ্ঞাপলক কি বলিয়া তোমাকে ডাকিবে।

কৃপাময়! যদি গোলাম এমন কোন অপরাধ করিয়া থাকে যাহার নিমিত্ত এত হা হুতাশ—এত দীর্ঘ নিশ্বাস—এত সকরুণ প্রার্থনা এত রোদন অরণ্যে রোদনের ন্যায় হইতেছে তাহা হইলে বলিয়া দাও কি করিলে আজ্ঞাপালক সে অপরাধ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিবে, তোমার এ আজ্ঞাধীন তাহা অকাতরে করিতে প্রস্তুত আছে। দয়াময়! আর কত কাঁদাইবে? এ যে পাপ, তাপ পূর্ণ দুর্ব্বল হৃদয়। অনাথনাথ! গোলামকে নিরাশ সাগরে ডুবাইও না। মহিমাময়! এ অবোধ মনে আর যে প্রবোধ হইতেছে না।"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই যুবার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন ;—

"আমার প্রতি লোকের একটা ধারণা আমি নাকি তাহাকে কাল বলিয়া ঘৃণা করি। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান খোদা! তুমি লোক লোচন হইতে আবরণ উন্মোচন করিয়া দাও। আমার হৃদয় ভাব সকলে অবগত হউক। হায়! মানুষ মানুষের মনের কথা বুঝিবার অধিকার পায়না কেন? আমি তাহাকে কাল বলিয়া ঘৃণা করি! তবে কি আমি রূপের প্রত্যাশি! হা অদৃষ্ট! হায়রে পোড়া কপাল! মানুষের কপাল যখন মন্দ হয় তখন সকলই সহ্য করিতে হয়। আমি ত তাহাকে কুরূপা বলিয়া এক দিনের জন্যও ঘৃণা করি নাই এবং কালে যে করিব তাহাও ভাবি নাই; তবে লোকে আমার প্রতি দোষারোপ করে কেন? এ অধমের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজ ঘাড়ে পাপের বোঝা লয় কেন? হায় খোদা! মানুষ কোরআন শরীফ পড়িয়া তোমার আদেশ উপদেশ মাথায় তুলিয়া লয় না কেন? তুমি কি বল নাই— "তোমরা অধিক অনুমান করা হইতে দূরে থাকিও নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ।" একথাটী লোকে বুঝেনা কেন?

হায়রে রূপ! রূপ লইয়া কি করিব? রূপ ক'দিনের জন্য? সে যে ক্ষণস্থায়ী। রূপ ধুয়ে খাবার বস্তু নয়, তুলে রাখবার সামগ্রী নয়, পরকালের সম্পত্তিও নয়। রূপ ফুটন্ত ফুল আজি ফুটিয়া আছে কালি শুকাইয়া যাইবে। হায়! আমি যাহার আদর করিতে জানি বা ইচ্ছা করি তাহা জগৎ বুঝেনা কেন? তবে রূপ যে মন্দ তাহাও বলিনা। দুনিয়ায় এমন মূর্খ কে আছে যে রূপকে মন্দ বলিবে। জগদ্বিখ্যাত পার্শী কবি হাফেজ তোমার রূপ নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়াই না তোমাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ছিলেন। হে পরম কারুণিক খোদা! তবে একটী

কথা—রূপ যদি কেবল রূপই হয়—তোমার সৃষ্টির শোভা রূপ এবং রূপের শোভা গুণ; রূপ যদি কেবল রূপই হয় তাহাতে গুণ না থাকে তাহা হইলে কোন বাতুলে সে রূপ ভাল বাসিবে? শিমুল ফুলকে কি কেহ আদর করিয়া হাতে লইতে যায় অথবা তাহার ঘ্রাণ লইবার ইচ্ছা করে? হায়! সেটীতে যে আমার আদর করিবার কিছুই নাই। সেটী যে কেবল রক্ত মাংসের একটী স্তূপ মাত্র।

খোদা! অদ্যকার মত এই পর্য্যন্তই শেষ। উপাসনার সময় উপস্থিত। ঐ আজান ধ্বনি উত্থিত হইল। তবে আবার সময় মত এই রূপ নির্জ্জনে তোমার নিকট দুঃখের কাহিনী কহিব; তুমি শুন বা শুন শুনাইতে থাকিব।"

এই সময় রক্তিম উষার প্রথম আলোকছটা পূর্ব্বগগণ আলোকিত করিয়া তুলিতে ছিল। বিটপী বিটপে বসিয়া কাক, কোকিল, দধিয়াল ইত্যাদি পক্ষিগণ বিভু গুণগানে তান ধরিতে ছিল। গৃহস্থ গৃহ হইতে নিশাবেদী পক্ষপুট ঝাড়িয়া বারবার প্রভাত ঘোষণা করিতে ছিল। যুবা চক্ষের জল মুছিয়া মছজিদের দিকে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ বাজারের হালুয়াই পট্টি রোডের মোড়ে দুইজন সুন্দর যুবকের সাক্ষাৎ। যুবকদ্বয় সহাস্যে করমর্দ্দন ক্রিয়া সমাপন করিতে করিতে এক যুবক অপর যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন;—"অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ।" দ্বিতীয় যুবক বলিলেন "নিশ্চয়।"

প্র-যু।—এখানে কখন ?

দ্বি-যু।—এই নয়টার ট্রেনে।

প্র-যু।—অদ্য আমার দাওৎ।

দ্বি-যু।—(ঈষদ্ধাস্যে) সে ত আনন্দের কথা; কিন্তু অনেক কাজ আছে সে সকল সারিয়া আজিকেই আবার রাত্রির ট্রেনে বাটী যাইতে হইবে।

প্র-যু।—এই বাটীইত সব অর্থের মূল, ইহাতেই না বন্ধু-বান্ধবকে পর করিয়া দিতেছে। এই বলিয়া মুচকিয়া হাসিলেন।

দ্বি-যু।—তাই নাকি ?

প্র-যু।—নিশ্চয় তাই। তা আপনি যাহাই বলুন; কিন্তু আজি যমের হাতে পড়িয়াছেন।

দ্বিতীয় যুবক দুই একবার আপত্তি করিয়া শেষে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তৎপর প্রথম যুবক বলিলেন "তবে এখন কাজ দেখিতে পারেন; কিন্তু বেলা চারিটার এদিকেই যাইতে হইবে, সে সময় আপনাকে কোথায় পাইব ?

দ্বি-যু।—বোধ হয় কাছারীতেই পাইতে পারেন।

প্র-যু।—তবে যান কাজ দেখুনগে আমারও কতক কাজ আছে— আসি। এই বলিয়া তিনি একটু অগ্রসর হইয়া কালীতলার প্রথম গলিতে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় যুবক কাছারীর দিকে চলিয়া গেলেন, বেলা তখন ১১টা।

যুবক যুগলের প্রথম যুবকের নাম আবদুল মতিন বিশ্বাস বাটী লক্ষীপুর এবং দ্বিতীয় যুবকের নাম জহুর উদ্দিন আহমদ নিবাস কামডোল গ্রাম। উভয় যুবকই গৌরববর্ণ দেখিতে বেশ সুন্দর। আবদুল মতিন বিশ্বাসের বয়স দ্বাবিংশ বৎসর; কিন্তু জহুর উদ্দিন আহমদ তাহা অপেক্ষা বয়সে দুই তিন বৎসর বড় হইবে বলিয়া বোধ হয়।

বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময় আবদুল মতিন জহুর উদ্দিনের সন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলেন তিনি কাছারীর হাতার মধ্যে একটা বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া জনৈক মুসলমান উকীলের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তাহাদের কথা বলা শেষ হইলে তিনি জহুর উদ্দিনকে বলিলেন "কি আপনার কাজ শেষ হইয়াছে?" জহুর উদ্দিন বলিলেন "হওয়ার মধ্যেই তবে একটু আছে সেটুকু বাটী যাইবার সময় সারিয়া লইলেও চলিতে পারে।" আবদুল মতিন বলিলেন "বেশ তাহাই হইবে এখন আসুন।" এই বলিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিম ফটক দিয়া কাছারীর হাতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

জেলা হইতে যে রাস্তাটী পশ্চিম দিকে গিয়াছে সেই রাস্তা ধরিয়া তাঁহারা নানা কথার গল্প করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন এবং গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া সে রাস্তা ত্যাগ পূর্ব্বক গো-গাড়ীর পথে নামিয়া পড়িলেন। তৎপর অনুমান দুই রসি পথ যাইয়াই আবার পশ্চিম মুখি হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষীপুর গ্রামের প্রান্ত ভাগে একখানা দেওয়ালের ভগ্নবাটী তাঁহাদের নয়ন পথে পতিত হইল। বাটী খানার আয়তন সাধারণ গৃহস্থের বাটী অপেক্ষা কিছু অধিক, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ঘরেরই চাল নাই, তবে দ্বার প্রাচীর ইত্যাদি এখনও কতক স্ব স্ব পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকল ঘরেরই ছাদ সমূহ ধ্বসিয়া গিয়া তির, বর্গা গুলি স্থানে স্থানে বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। বাটীর দক্ষিণ ভাগে রাস্তার ধারে পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগে লম্বা হইয়া অনেকগুলি ঘাই (রেশমের সূত্র নির্ম্মাণ আধার বিশেষ) বাঁধা। জহুর উদ্দিন বাটীখানা দেখিয়া আবদুল মতিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "এ ভগ্ন বাটী খানা কাহার হইল ?" আবদুল মতিন বলিলেন; "আসুন সে হতভাগার কথা পরে জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া তাঁহারা আরও কতিপয় বাটী অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শের একখানা বাটীতে উঠিয়া পড়িলেন।

বাটী খানার চারি ভিটায় চারিখানা খড়ের ঘর। ইহা ব্যতীত আরও দুই এক খানা ক্ষুদ্র ঘর আছে। দক্ষিণ ভিটার ঘর খানার পশ্চাদ্ভাগে এক খানা বারাণ্ডা। বারাণ্ডার মেজেখানি ততদূর পরিষ্কার নহে, তাহাতে একখানা চৌকি ও একখানা হিলানী বেঞ্চ পাতা ছিল। আবদুল মতিন সেই বেঞ্চখানায় জহুর উদ্দিনকে বসিতে বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে জহুর উদ্দিন বেঞ্চখানায় উপবেশন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই ক্ষুদ্র বাটী খানা কাহার হইল ? ইহাই কি আবদুল মতিন বিশ্বাসের বাটী ? না এ ক্ষুদ্র বাটী খানা ত তাহার বলিয়া বোধ হয় না। শুনিয়াছি তাহার পিতা সাহেব এখানে আসিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও গৃহস্থালীর ঠাট বাট অধিক করিয়া ছিলেন। এই ত অল্প দিবস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ইতঃমধ্যেই কি আবদুল

মতিন এতদূর অধঃপাতে গিয়াছেন ? না ইহা ত বিশ্বাস হয় না, আবদুল মতিন তরুণ যুবা হইলেও যেরূপ চরিত্রবান লোক তাহাতে এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে এত দূর অধঃপাতে যাইতে পারেন না। বোধ হয় এখানে অন্য কাহার বাটী হইবে। কোন প্রয়োজন বশতঃ উঠিয়া থাকিবেন।

তিনি এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সদ্যঃ ফুটন্ত পরিজাত বৎ একটি নবম বর্ষিয়া বালিকা এক ঘটী জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া সরলতা পূর্ণ সুমধুর বালিকা কণ্ঠের ধীর স্বরে বলিল ; “আপনি পা ধুন।”

বালিকার পরণে সাদার উপর হরিদ্রা ও নীল বর্ণের পদ্মফুল তোলা পাছা পাড়ের শাড়ী। গায়ে গোলাবি রংঙের কুর্ত্তা। পদদ্বয়ে দুই গাছি রৌপ্য মল। দুই হাতে ছয় গাছি চাঁদির চুড়ি ও দু'গাছি বলয়। বালিকাটী পরমা সুন্দরী।

জহুর উদ্দিন বালিকাটির মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ‘বিশ্বাসজী তোমার কে হন ?” বালিকা বলিল, ‘ভাই।’ জহুর উদ্দিন বলিলেন, ‘তিনি বাটীতে কি করিতেছেন ?” বালিকা বলিল, ‘ওজু।’ জহুরুদ্দিন আবার বলিলেন, ‘এ বাটীখানা কি তোমাদেরই ?’ বালিকা নীরব।

জহুরুদ্দীন বালিকার মুখের প্রতি গাঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন তাহার অমন সুন্দর কাঁচা মুখ খানি যেন একটু মলিন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আর এ বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আছরের নামাজ পাঠের নিমিত্ত ওজু করিতে বসিলেন। এদিকে বালিকাটী আঁচল দোলাইয়া ঝুনুং ঝুনুং করিতে করিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জলদাগম। তেসরা আষাঢ়। রাত্রি প্রায় দশটা। আকাশে নক্ষত্র নাই, নক্ষত্রেশ নাই—বিমান মণ্ডল মেঘে ঢাকা। প্রকৃতি অনিলশূন্য নিথর। ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ রবে চারিদিক মুখরিত। এই সময় আব্দুল মতিন বিশ্বাস ও জহুর উদ্দিন আহমদ নৈশপ্রশনান্তে সেই ক্ষুদ্র বাটী খানার ভিতর দক্ষিণ দ্বারি ঘরখানার অলিন্দে বসিয়া আলবোলা দেবীর মুখ চুম্বন করিতে করিতে গল্প আরম্ভ করিলেন।

উভয়ে উভয়কে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ও উত্তর আদান প্রদানের পর আবদুল মতিন জহুর উদ্দিনকে বলিলেন;—একটা কথা মনে হইল—আপনি ওখানকার বাটীতে থাকার সময় একবার নিকাহ করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, সে নিকাহটা করা হইয়াছে কি?

জ।—না।

আঃ।—কি বলেন—তবে কি এখন তিনিই আছেন?

জ।—জি হাঁ।

আঃ।—তাঁর দ্বারা সংসার চলে ত?

জ।—না চলিলেও কোনরূপ কষ্টে সৃষ্টে চালাইতে হয়।

আবদুল মতিন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন;—তাহা হইলে বোধ হয় এখন বেশ সুন্দরীটী হইয়া থাকিবে। কি দুঃখের কথা! আপনি এত দিন ধরিয়া সেই হাবীটা ল'য়েই সংসার করিয়া আসিতেছেন। কোন একটা নিকাহ বিয়ে করিতে পারেন নাই শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম।

জহরুদ্দীনের মুখ খানি মলিন হইয়া উঠিল। তিনি কাতর স্বরে বলিলেন, 'কি করিব ভাই তকদির। (অদৃষ্ট) তবে সে আশা এখনও ত্যাগ করি নাই।

আঃ।—বেশ, আশা করে বসে থাকা আর চেষ্টা করে সে আশাকে পূরণ করিয়া লওয়া কি এক কথা?

জ।—চেষ্টা যে করিনা তাহা নহে; কিন্তু কোন মতেই সে আশা লতা ফলবতী হয় না তাই মনে করিতেছি সকলের মূল তকদির তার বেশী কমি কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

আঃ।—তকদির মূল বটে, কিন্তু তাহাও দুই প্রকার।

জহরুদ্দীনের মলিন মুখে একটু হাসির ক্ষীণ আভা বিকাশ হইল; তিনি বলিলেন;—অদ্য একটা নূতন কথা শুনিলাম। আচ্ছা তকদির দুই প্রকার কি কি?

আঃ।—কেন, আপনি কি এতদিন তাহা শুনেন নাই?

জ।—না, অদ্যই প্রথম শুনিলাম।

আঃ।—আচ্ছা সময় মত এবিষয় আপনাকে বুঝাইয়া দিব। তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই "ঈদু ঈদু" বলিয়া বাটীর বালক ভৃত্যটিকে ডাক দিলেন; কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। বোধ হয় সে সময় বালক ভৃত্যটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিধায় তিনি স্বয়ং কলকেটা হস্তে করিয়া তামাক সাজাইতে উঠিয়া গেলেন। এদিকে জহরুদ্দীন ঘরে কপাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

তাঁহারা দক্ষিণ দ্বারি যে ঘরখানার অলিন্দে বসিয়া বাক্যালাপে করিতে ছিলেন, সেই ঘরের মেজেতে পিতলের দীপাধারে একটি স্ফটিক দীপ দীপিয়া দীপিয়া জ্বলিতেছিল এবং তাহাদের বাক্যালাপের প্রারম্ভ হইতেই একটী পঞ্চদশ বর্ষিয়া বালিকা কপাটের আড়ে দাঁড়াইয়া তাহাদের

কথোপকথন শুনিতে ছিল। প্রদীপের আলোটুকু বালিকার ঠিক কাঁচা মুখ খানির উপর পড়িয়া তাহার জ্যোতিঃ জড়িত মুখ খানিকে আরও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছিল।

জহুর উদ্দিন গৃহাভ্যন্তরে দেখিতেই সহসা তাহার দৃষ্টি বালিকার মুখ মণ্ডলে নিপতিত হইল। যেমন দৃষ্টি অমনি চা'রচক্ষের মিলন। বালিকা লজ্জায় সঙ্কোচিতা হইয়া পশ্চাদ্দিকে হটিয়া যাইতে তাহার পদদ্বয়ের মল হু'গাছিতে ঠেস্ লাগিয়া "ঢন্" করিয়া বাজিয়া উঠিল। এদিকে জহুরুদ্দীনও লজ্জায় অধঃবদন হইলেন।

এই সময় রান্না ঘরের দিক হইতে "দুখী দুখী" বলিয়া ডাক আসিল; কিন্তু সে ডাকের কোন উত্তর হইল না। এদিকে আবদুল মতিন বিশ্বাস কলকেতে ফুৎকার দিতে দিতে আসিয়া বলিলেন, "দুখী, মা ডাকে যে।" তথাপিও কোন উত্তর হইল না। তিনি পুনরায় "দুখী ও দুখী" বলিয়া ডাকিলেন। এবার কোকিলকণ্ঠ বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে অথচ ধীর কণ্ঠে উত্তর হইল "কেন।" আবদুল মতিন বিশ্বাস বলিলেন "মা' ডাকিতেছেন। ইনি তোমার ভাই হয়েন। এখান দিয়া বাহির হইয়া যাও।

বালিকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ধীর পদ সঞ্চালনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এই সময় জহুর উদ্দিন আর একবার বঙ্কিম নয়নে বালিকার প্রতি চাহিলেন; তিনি দেখিলেন যেন নব কুসুমিতা লতিকা সৌন্দর্য্যভারে ভারী হইয়া মৃদু মৃদু অনিল সোহাগে হেলিতে দুলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। এই দর্শন হইতে দর্শকের হৃদয়ে মহাসিন্ধুর প্রবল তাড়ণা আরম্ভ হইল।

আবদুল মতিন বিশ্বাস পূনর্ব্বার পূর্ব্বাসন অধিকার করিয়া তামাক

সুখ শান্তি এবং দুঃখ তাপ যে জিনিষটার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাহা আপনি বিশেষ অবগত আছেন। পরন্ত না হয় এখন একজন ভ্রাতা আপনার সঙ্গে আছেন, কিন্তু তিনি ত আর চিরকাল থাকিবেন না, অবশ্যই একদিন পৃথক হইবেন। ভাবিয়া দেখুন সে সময় সংসারের যাবতীয় ভার আপনারই ঘাড়ে চাপিয়া পড়িবে। সে অবস্থায় ও হাবিটা দ্বারা কোন মতেই আপনার সংসার চলিবে না। দ্বিতিয়তঃ এখন আপনার জননী সাহেবা জীবিত আছেন বলিয়াই কিছু টের পাইতেছেন না। খোদা না করেন তাঁহার কোন একটা ভাল মন্দ হইলে আপনার যে দশদিক অন্ধকার হইবে তাহাকি কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? তাই বলি সংসার সঙ্গে থাকিতেই একটা ভাল পাত্রী দেখে শুনে আপনাকে বিবাহ করা উচিৎ, নচেৎ দেখিতেছি আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভাই, আমার বিবেচনায় যাহা ভাল বলিয়া বোধ হইল একরূপ উপযাচক হইয়াই তাহা বলিয়া ফেলিলাম এখন আপনার ইচ্ছা।

আবদুল মতিনের বাক্যে জহুরুদ্দীনের হৃদয় আলোড়িত হইয়া নয়ন দ্বয় ছল ছল হইয়া উঠিল। তিনি "ভাই" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ঢোক চিপিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, আপনি যাহা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন আমি বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহা স্থির করিয়াছি, কিন্তু—।

আ।—বোধ হয় সে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না?

জ।—জি তাহাই।

আ।—চেষ্টার বহির্ভূত কি আছে ভাই!

জ।—বলিয়াছি ত চেষ্টার ত্রুটী নাই; কিন্তু ঘটিয়া উঠে না।

আ।—প্রতিবন্ধক?

জ।—পূর্ব্বে যে সকল বাধা ছিল, এখন চেষ্টা করিলে সে সকল দূর

সৎপাত্রী জুটিয়া উঠেনা এবং জুটিলেও সতিনের উপর সম্বন্ধে কেহ দিতে চাহেনা।

আ।—সতিনের উপর মেয়ের বিবাহ দিতে অজ্ঞ লোকেরাই অগ্র-পশ্চাৎ করিয়া থাকে বা সেটাকে দোষাবহ বলে মনে করে। তাহারা কাণ্ডজ্ঞান হীন ধর্ম্মের বিধান মোটেই বুঝেনা; কিন্তু আমরা তাহা দোষাবহ বলে মনে করি না। আমাদের নবি সাহেবেরই ত চৌদ্দজন বিবি ছিলেন। এ অধমেরও হুইটী এবং আমাদের ত্বখীও বিধবা তাহার নিমিত্ত যদি কোন থান হইতে ভাল ঘরে ভাল বরে সম্বন্ধ আসে তাহা হইলে আমরা সতিন টতিন দেখিব না।

"তুখী বিধবা" এই বাক্যটী শ্রবণ মাত্রই জহুর উদ্দিন যেন এক স্বপ্ন-রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এ স্বপ্নরাজ্যে তাহার অবস্থান অধিক্ষণ ঘটিল না। আবদুল মতিন বিশ্বাসের কথার উত্তরে তাঁহাকে বলিতে হইল, "আপনার ন্যায় ত আর সকলে বুঝে না।"

আ।—তা না বুঝুক, আপনি যদি বিবাহ করেন তাহা হইলে মাসেক দু'মাসের মধ্যে দেখে শুনে আপনার পছন্দ মত একটা সৎপাত্রী যোগাড় করিয়া দিতে পারি।

আবদুল মতিন বিশ্বাসের আশ্বাস যুক্ত বাক্যে জহুরুদ্দীনের হৃদয় খানি আশা কুহকিনীর আনন্দরসে পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অদ্য তাহার বাল্য-সহচর আবদুল মতিন বিশ্বাস যেরূপ আশ্বাস বাক্যে তাহাকে আশ্বাসিত করিলেন ইতঃপূর্ব্বে তাহাকে সেরূপ আশ্বাস কেহই প্রদান করে নাই। কিন্তু লজ্জা বশতঃ সহসা আবদুল মতিন বিশ্বাসের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাক, সময় মত বলা যাইবে। রাত্রি অধিক হইয়াছে চলুন এখন নামাজ পড়িয়া শোয়া যাক।"

আবদুল মতিন বিশ্বাসও আর কোন কথা বলিলেন না। অতঃপর তাহারা এশার নামাজ পড়িয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে জহুর উদ্দিনের সুনিদ্রা হইল না। তিনি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে করিতেই বিভাবরী স্বীয় পালা সমাপ্ত করিল।

প্রাভাতিক উপাসনা সমাপনান্তে জহুরুদ্দীন বাটী যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আবদুল মতিন বিশ্বাস বাধা দিয়া বলিলেন, "না আপনি দু'টা নাস্তা না করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।" জহুর উদ্দিনের মন যাহাই বলুক কিন্তু তিনি মুখে বলিলেন, "জি-না আর বাধা দিবেন না এখন না গেলে কাজ শেষ করিয়া ট্রেন ধরা যাইবে না।" আবদুল মতিন বিশ্বাস নাছোড় বান্দা। তিনি মুচকি হাসিয়া বলিলেন. "আপনার ট্রেন পলাইবে না এখন অনেক সময় আছে, নাস্তা করিয়া অনায়াসে যাইতে পারিবেন।"

জহুরুদ্দীন আর কোন আপত্তি না করিয়া সেখানেই জলযোগ পূর্ব্বক বেলা আট ঘটিকার সময় লক্ষ্মীপুর ত্যাগ করিলেন। তাহার বিদায় কালে আবদুল মতিন বিশ্বাস বলিলেন, "বাটী গিয়ে বুঝে সুঝে যা হয় একটা মতামত জানাইবেন।" জহুরুদ্দীন গ্রীবা বক্র করিয়া উত্তর প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

জহুরুদ্দীন রাজ পথ ধরিয়া পূর্ব্ব মুখে চলিয়াছেন। পথে নানা রকমের গাড়ী, ঘোড়া ছুটা ছুটি করিতেছে। বন্যার প্লাবনের ন্যায় রাশি রাশি লোক যাতায়াত করিতেছে। বাবুদের জুতার ঠক্ঠকানি মচ্-মচানিতে কানে তালা লাগাইয়া দিতেছে। কিন্তু জহুর উদ্দিনের সে দিকে আদৌ দৃক্পাত নাই—তিনি আপন মনে আপন গতিতে চলিয়াছেন, তবে মধ্যে মধ্যে এক একবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিতেছেন তাহার মনে হইতেছে আবদুল মতিন বিশ্বাস আসিয়া আজও যদি তাহাকে

থাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি কতই না সুখী হয়েন। আশা মায়াবিণী! হায়! কল্পনার সঙ্গে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় কবে! কই আবদুল মতিন বিশ্বাস ত তাহাকে ডাকিতেছেন না।

তিনি এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তার ধারে একটা পুকুরের পাড়ে বসিয়া পড়িলেন। এবং উপবেশন পূর্ব্বক কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় একটী পশ্চিম দেশীয় রমণী একটা পাঁচ ছয় মাসের শিশু পুত্র ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে আসিয়া ফিঁকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "সাহেব অভাগীর প্রতি দয়া করুন।" এই বলিয়া সে আরও জোরে কাঁদিতে লাগিল। জহুর উদ্দিন তাহার কান্নার ভাব বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ কেন? এবং আমাকে কিরূপ দয়া করিতে বলিতেছ?"

রমণী কান্না রোধ করিয়া চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল, "সাহেব আমরা জাতিতে কুড়মি, বাটী মজফ্ফরপুর জিলা। আমার স্বামী দরিদ্রতা বশতঃ দেশে অন্নকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ন সংস্থান হেতু ইংরাজবাজার আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়াই তাঁহার জ্বর হয় অদ্য চারিদিবস হইল আমরা দুইটী প্রাণীকে অকূল পাথারে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া সে আবার কাঁদিতে লাগিল। জহুরুদ্দীন বলিলেন, "এখন তুমি কি করিবে—বাড়ী যাইবে?" রমণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "আমার হাতে একটী পয়সাও নাই—অদ্য দুই দিন ধরিয়া অনাহারে আছি।" জহুরুদ্দান তাহার হাতে তিনটী টাকা দিয়া বলিবেন, "যাও মা আস্তে আস্তে বাটীর দিকে অগ্রসর হও।" রমণী আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

রমণীর কান্না শুনিয়া সেখানে আরও কতিপয় লোক জুটিয়া ছিল। রমণী প্রস্থান করিবার পর জনৈক লোক জহুরুদ্দানকে বলিল "সাহেব

ওকে টাকা দিলেন কেন? পশ্চিম দেশের লোক, বড় নির্দ্দয়, ওদের কিছু দিতে নাই। ও শালাদের কলকেতে টিকিয়া ধরাইতে গেলেও শালারা দেয় না।" জহুর উদ্দিন বলিলেন, "তাদের চরিত্র তাদের সঙ্গেই থাক আমরা বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক হইব কেন?" লোকটা "মশয় আপনার টাকা বেশী হয়েছে।" বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। এদিকে জহুরুদ্দীন পূর্ব্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

অনুমান দশ মিনিট সময় হইয়াছে এমন সময় জনৈক পথিক গান গাহিতে গাহিতে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহার গানের মধ্যে এই একটী অন্তরা ছিল, "চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাথা।" হায়! মরার উপর খাড়ার ঘা! জহুরুদ্দীন আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না অমনি উঠিয়া পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার পা দু'খানি যেন পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিনা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"আজি ভাই একটী জটিল প্রশ্ন লয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি।" এই বলিয়া যুবতী বালিকার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

বা।—প্রশ্নটা কি ?

যু।—আজি সকালে তমিজের বাবা বাজারে গিয়াছিল, সে নাকি যাইবার সময় তমিজের মাকে বলিয়া গিয়াছিল তোমার জন্ত পাছা পাড়ের শাড়ী আনিব। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আনিতে পারে নাই। তাই তমিজের মা' চক্ষু লাল করিয়া বলিল তুমি বেঈমান। আচ্ছা ভাই বল দেখি বেঈমান বলে কাকে ?

বা।—যাহার ঈমান নাই সেই বেঈমান।

যু।—ঈমান কি ?

বা।—কেন তাহাকি তুমি জান না ?

যু।—সকলে ঈমান ঈমান বলে তাই জানি ঈমান, কিন্তু ঈমান বলে কাহাকে তাহা জানি না।

বা।—বড়ই দুঃখের কথা! আমাদের মোসলেম সমাজে তোমার ন্যায় অনেকেই স্ত্রী পুরুষ আছে তাহারা মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে মুখেও ইসলাম; কিন্তু ইসলামের মূল ঈমান যে কি তাহা আদৌ বুঝেনা হায়রে ইসলামের অধঃপতন!

যু।—ভাই গোটা দুনিয়াটার ভাবনা ভাবিয়া কি করিবে, আমি জানিনা জানিতে চাই বুঝাইয়া দিয়া চরিতার্থ কর।

বা।—ভাই ঈমান সমস্তার সমাধান করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ আমি অবোধ বালিকা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে শুন যাহা জানি তাহাই মোটামোটি ভাবে বলিতেছি।—অনেক গুলি শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট যেমন গাছ থাকে, ঈমানও তদ্রূপ কতক গুলি শাখা বিশিষ্ট। তবে তাহার মূল হইতেছে "বিশ্বাস" সেও আবার কতিপয় কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তাহার প্রথম হইতেছে 'কলেমা' অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার একত্বে বিশ্বাস করা ও শেষ পয়গম্বর মোহাম্মদকে (দঃ) নবি বলিয়া স্বীকার করা। মানুষ যেমনই হউক যে অবস্থাতেই থাকুক তাহাকে এক আল্লাহ এবং তাহার অংশীদার অন্ত কেহ নাই মানিতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ ফেরেস্তাগণকে বিশ্বাস করা।

যু।—আমি ভাই ফেরেস্তার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিনা তাঁহারা কে ?

বা।—আমরা যেমন খোদার সৃষ্ট জীব জগদ্বাসী মানব তাঁহারাও তদ্রূপ খোদার সৃষ্ট জীব আকাশ বাসী ফেরেস্তা তবে পৃথক এইযে খোদা মানুষকে মাটি দিয়া গড়িয়াছেন আর তাঁহাদিগকে নূরে পয়দা করিয়াছেন। ফেরেস্তার মধ্যে চারিজন সর্ব্ব প্রধান। প্রথম জিব্রাইল।' ইনি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত পয়গম্বরগণের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ উপদেশ ইত্যাদি সংবাদ বহন করিতেন ; কিন্তু শেষ নবির মৃত্যু হইবার পর তাঁহার সে কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবে কেতাবে খবর আছে কিয়ামতের পূর্ব্বে আরও একবার দুনিয়ায় আসিবেন। দ্বিতীয় ফেরেস্তার নাম 'মিকাইল'। ইনি আল্লাহ তায়ালার আদেশানুযায়ী জীবগণের আহার্য্য ও পানীয় ইত্যাদি বিতরণ করিয়া থাকেন। তৃতীয় ফেরেস্তার নাম 'ইস্রাফিল' ইনি একটা সিঙ্গায় মুখ

লাগাইয়া দুনিয়ার আদিকাল হইতে খোদার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

যু।—কিসের আদেশ?

বা।—ফুৎকার দিবার।

যু।—সে ফুৎকার দিলে কি হইবে?

বা।—সেই ফুৎকারেই দুনিয়ার লীলা ধ্বংস হইয়া যাইবে। এখন আমরা দুই চক্ষে যাহা দেখিতে পাই, দুই কানে যাহা শুনিয়া থাকি তাহার কিছুই থাকিবে না।

যু।—ইয়া আল্লা! সে দিন কখন হইবে বুবুজান?

বা।—এক খোদা ব্যতীত তাহার খবর কেহই জানে না। তবে কেতাবে এই মাত্র খবর আছে যে, শুক্রবারে হইবে। তাই জিন ও মানব ব্যতীত অন্যান্য সকল জীবই শুক্রবার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'আল্লা আল্লা' বলিতে থাকে।

যু।—প্রত্যেক শুক্রবারেই কি তাহারা সেরূপ করে?

বা।—হাঁ।

।—হায় আল্লা, মানুষ নামের কলঙ্ক আমরা!

বা।—শুন চতুর্থ ফেরেস্তার নাম 'আজরাইল' ইনি খোদার হুকুমে সকলের প্রাণপাখীটী ধরিয়া লইয়া যান—যাহাকে লোকে 'যম' বলে। ইহা ব্যতীত আরও অনেক ফেরেস্তা আছেন তাঁহাদের সংখ্যা খোদা ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। এই একটা কথা শুন, আমাদের শেষ নবি সাহেব মেরাজে যাইয়া দেখিয়াছিলেন চতুর্থ আকাশে 'বয়তুল মামুর' নামক ফেরেস্তাদের তীর্থস্থান একখানা ঘর আছে, সেই ঘর খানাকে প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ ৭০ হাজার করিয়া ফেরেস্তা আসিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া যান; কিন্তু যাঁহারা একবার প্রদক্ষিণ করিয়া যান তাঁহারা জীবনে আর

কথনও আইসেন না!—দুনিয়ার আদিকাল হইতে এইরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছেন এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত করিতে থাকিবেন ইহাতেই অনুমান কর খোদা কত ফেরেস্তা সৃষ্টি করিয়াছেন। সে যাহা হউক ফেরেস্তাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে।

যু।—সুবহান আল্লা! কথা শুনে ত বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়। আচ্ছা তারপর?

বা।—আল্লাহতাআলা আকাশ হইতে যে সকল কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন সে সকল কেতাবকে খোদার কেতাব বলিয়া বিশ্বাস করা;—যথা তৌরাত, ইঞ্জিল, জববুর, কোরআন ইত্যাদি।

যু।—কোরআন সরিফের ন্যায় কি সে সকল কেতাবও মানিয়া চলিতে হইবে?

বা।—না, সে সকল কেতাবের বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে না। কেবল খোদা-প্রদত্ত কেতাব এই কথা বিশ্বাস করিতে হইবে।

যু।—তার পর আর কি?

বা।—খোদা প্রেরিত নবিগণকে বিশ্বাস করা। তকদির এবং তাহার ফলাফলও মৃত্যু ঘটাবার পর পুনর্ব্বার জীবিত হওয়া বিশ্বাস করা। পরকাল বিশ্বাস করা। এই কথা ক'টিতে যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবে সেই ঈমানদার। আর যে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপনে অক্ষম সেই বেঈমান।

যু।—তাহা হইলে মিথ্যা বলিলে বেঈমান হয় না?

বা।—না, তবে তাহা বলা মহাপাপ। যাও ভাই আজি, আর এক-দিন। যুবতী প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আম, জাম, তাল, বেল, খেজুর, নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষ পরিশোভিত ও চারিদিকে ফজলি-আমের বাগান বেষ্টিত লক্ষ্মীপুরগ্রাম ; গ্রামের যে দিকে দৃষ্টি করা যায় সে দিকেই বাগান কেবলই ফজলি আমের বাগান। গ্রামের অধিবাসী প্রায় মুসলমান এবং অধিকাংশই ব্যবসায়ী। তন্মধ্যে রেশমের ব্যবসায়ই প্রধান। এই লক্ষ্মীপুরগ্রামে আমির আলি বিশ্বাসের বাস। ইতঃপূর্ব্বে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন ; কিন্তু জানিনা কি কারণে তিনি উক্ত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সেই সুদূর লক্ষ্মীপুর গ্রামে বাসস্থান স্থাপনপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। তিনি বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন বিধায় এখানে আসিয়া তাঁহাকে সংসার গঠনে অধিক সময় লাগিল না। অল্প দিবস মধ্যেই সংসারের যাবতীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া একঘর ভাল গৃহস্থ হইলেন ; কিন্তু এখানে আসিবার পর তাঁহার আর্থিক অবস্থা দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। মানুষের অবস্থা যখন স্বচ্ছল হয় তখন নানা দিকদিয়া খিয়ালও উচ্চ হইতে থাকে। তিনি দেখিলেন গ্রামের লোক রেশমের সূতা কাটা ব্যবসায় করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিতেছেন তাই তিনিও স্বীয় শ্রমার্জ্জিত তিন সহস্র টাকা মূলধন লইয়া প্রথম প্রথম ঘাই জ্বালাইয়া সূতাকাটা কারবার আরম্ভ করিয়া দিলেন। কারবারে বেশ লাভ হইতে লাগিল। তিনি আশানুরূপ লাভ দেখিয়া বিশেষ জাঁকজমকের সহিত কারবার চালাইতে লাগিলেন, তাহাতে দুই বৎসর মধ্যেই তাঁহার

মূলধন প্রায় দশ সহস্র টাকায় দাঁড়াইল। যে কোন ব্যবসায় হউক না কেন তাহাতে আশানুরূপ লাভ হইলে সেই ব্যবসায়ই ব্যবসায়ীর উৎসাহ-বর্দ্ধক হয়। তিনি তৃতীয় বৎসরে ইংরাজ বাজারের জনৈক মাড়োয়ারী মহাজনের নিকট আরও কিছু টাকা পুঁজি লইয়া দ্বিগুণ-কলেবরে কারবার চালাইতে লাগিলেন। মূলধন যেরূপ অধিক হইল সেই অনুপাতে ব্যবসায়ে লাভও অধিক হইতে লাগিল। এই অর্থোন্নতির যুগে তিনি গাড়ী, ঘোড়া, জোত জমা ইত্যাদি বাটীর আসবাবপত্রও আশানুরূপ করিয়া লইলেন। ইহা ব্যতীত ত্রিশ বিঘা ফজলি আমের বাগানও ক্রয় করিয়া লইলেন। বলিতে কি অল্প সময় মধ্যেই তিনি সে অঞ্চলে একজন মোটা গোছের লোক হইয়া দাঁড়াইলেন।

আমির আলি বিশ্বাস ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মভীরু চরিত্রবান পুরুষ। ইসলাম ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় সৎকার্য্য তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কড়া ক্রান্তি ভাবে আদায় করেন। তিনি একপক্ষে যেরূপ শিষ্টের পালন করেন অপর পক্ষে দুষ্টকে দমন করিতেও, তদ্রূপ কঠোর হস্ত।

আমির আলি বিশ্বাসের আর্থিক অবস্থা যেরূপ দিন দিন উন্নত হইতেছিল তৎসঙ্গে তদ্রূপ তাঁহার মান সম্ভ্রম ইত্যাদিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি অল্প দিবস মধ্যেই তিনি সে অঞ্চলে একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তদঞ্চলের যে কোন প্রকারের কলহ, বিবাদ হউক না কেন প্রথমে তাঁহার নিকট পেশ না করিয়া অথবা তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া পুলিশ বা আদালতের আশ্রয় প্রায় কেহই লইত না। তিনি ন্যায় ভাবে অধিকাংশ বিবাদেরই মীমাংসা করিয়া দিতেন,—এবং বিচারকার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেন। তাঁহার ঘুষখোরী, বা পক্ষপাতি দোষের চর্চ্চা আদৌ শুনা যাইত না। এইরূপে তাঁহার সুযশের দুন্দুভি

ক্রমান্বয়ে দেশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল; কিন্তু মানুষ যেমনই গুনী, জ্ঞানী, ধনী, মানী, খ্যাতিপন্ন, ক্ষমতাবান, দক্ষতাবান হউন না কেন তিনি কোন মতেই শত্রু শূন্য হইতে পারেন না। যেখানে শত শত জন মিত্র থাকে সেখানে দু'দশ জন শত্রু না থাকাই আশ্চর্য্যের কথা।

আমির আলি বিশ্বাসের এই উন্নতির যুগে একদল গুণ্ডা তাঁহার প্রতি ঈর্ষা পরবশ হইয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার নিমিত্ত তাঁহার শ্রমার্জ্জিত বিরাট বাটীখানা একবার পাবক দেবের গ্রাসে তুলিয়া দিল। ইহাতে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হইলেও তিনি দমিলেন না এবং তাঁহার সাংসারীক উন্নতিরও বিশেষ লাঘব পরিলক্ষিত হইল না। তবে বিধাতার এই একটা মহতী বিধান যে, চিরসুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই সময় তিনি সহসা জ্বরপীড়ায় পীড়িত হইলেন। চেষ্টা অনেকই করা হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না; একাদশ দিবসের জ্বরে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়া সমাধির সুশীতল গর্ভে স্থান অধিকার করিলেন। পরিবার মধ্যে একমাত্র যুবা পুত্র আবদুল মতিন বিশ্বাস ও সফুরা উর্ফে দুখী এবং রাহেলা নাম্নী কন্যাদ্বয় ও গৃহিণী এবং দুইটী পুত্রবধূ রাখিয়া গেলেন।

আবদুল মতিন বিশ্বাস যুবা পুরুষ। চালাক চতুরও মন্দ নহেন। পিতার যত্নে কিছু শিক্ষা দীক্ষাও পাইয়াছেন। দেখিতেও সুন্দর। পিতার মৃত্যু হইবার পর তিনি তাঁহারই পথানুসরণ করিয়া কারবার চালাইতে লাগিলেন কিন্তু তিনিও মরহুম পিতার শত্রুগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। শত্রুগণ সেই বৎসরই জৈষ্ঠ মাসের মধ্যাংশে একরাত্রিতে আগুণ ধরাইয়া দিয়া তাঁহার পৈতৃক নির্ম্মিত বিরাট বাটীখানা ভস্মে পরিণত করিল। এই অগ্নিতে আবদুল মতিন বিশ্বাসের বিশেষ ক্ষতি হইল, কেন না তাঁহার মরহুম পিতা যেরূপ সতর্কতার সহিত রেশম ও সূতা রক্ষা করিতেন তিনি তদ্রূপ পারেন নাই। তাই এই অগ্নিতে তাঁহার

প্রায় পঞ্চদশ সহস্র টাকা মূল্যের রেশম ও সূতা পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

আবদুল মতিন বিশ্বাস পুনর্ব্বার বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। খড়, বাঁশ, দড়ী ইত্যাদিও কিছু কিছু সংগ্রহ করা হইল; কিন্তু উক্ত মাসের শেষাংশে এক দিবস অতিশয় বৃষ্টিপাত হইয়া ঘরগুলির দেওয়ালের অধিকাংশ ধ্বসিয়া পড়ায় তিনি আর বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিলেন না। বর্ষাও প্রায় আগত; অগত্যা তিনি সপরিবারে স্বীয় গ্রামে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তবে গরু, ঘোড়া ইত্যাদি চাকর-বাকরের বাসোপযোগীমাত্র কএকখানা খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া লইলেন। পাঠক পাঠিকা! আপনারা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে ভগ্ন বাটীখানা দেখিয়া আসিয়াছেন তাহাই আবদুল মতিন বিশ্বাসের ভগ্নবাটী।

আমির আলি বিশ্বাস জীবিত কালে জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল মতিন বিশ্বাসের দুইটী বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং পুত্রের প্রথম বিবাহের সঙ্গে পঞ্চম বর্ষিয়া কন্যা সফুরা খাতুনকেও স্বগ্রামে একটা সৎপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবাহের অল্প দিবস পরই বালিকা সফুরার বালক স্বামী কালগ্রাসে পতিত হয়। সফুরা খাতুন বালবিধবা বলিয়া তাঁহার জননী তাহার দুরদৃষ্টজ্ঞানে তাহার প্রকৃত নাম গোপন করিয়া 'দুখী' বলিয়া ডাকেন। সেই সময় হইতেই সফুরা খাতুন দুখী নামে অভিহিত হয়।

আমির আলি বিশ্বাস, ইচ্ছা করিয়া পুত্রের দুইবার বিবাহ দেন নাই; বলিতে গেলে একরূপ বাধ্য হইয়াই দিয়াছিলেন। কেন না দেশের কু-প্রথা অনুসারে বাল্যাবস্থাতেই পুত্রের প্রথম বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু সময় মত পুত্রও পুত্র বধূতে খাপ খাইল না। পুত্রটী অল্পকাল মধ্যেই যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন; কিন্তু বধূটির সেই বেগুনতলার হাট ভাঙ্গিলনা সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দিতে হইয়াছিল।

লোকে কথায় বলে "সতিনের বাদে বাঁঝিন বিয়ায়" কার্য্যতঃ তাহাই হইল। স্বামীর বিবাহের কিছুকাল পরই বধুটীর বেগুণ তলার হাট ভাঙ্গিল। ক্রমে সে যুবতী ও দিব্য সুন্দরী হইয়া উঠিল। কাজেই আবদুল মতিন বিশ্বাসকে দুইটী স্ত্রী লইয়া সংসার করিতে হইল। তবে সচরাচর সতিনের মধ্যে যেরূপ ঈর্ষাদেবীর চরণ সেবা করিতে দেখা যায়, আবদুল মতিন বিশ্বাসের স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে সেরূপ বড় একটা কিছু দেখা যায় না। তাহারা দু'টীতে প্রায় ভগ্নীর ন্যায় মিলিয়া মিশিয়া চলে।

আমির আলী বিশ্বাসের জীবিত কালে অনেক ভাল ভাল এবং বড় বড় ঘর হইতে সফুরা বা দুখীর বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া ছিল; কিন্তু "মেয়ে সম্পূর্ণ বয়স্থা না হইলে কোথাও বিবাহ দিব না।" বলিয়া তিনি সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন। কেননা পুত্রের বাল্য বিবাহের অপকারিতা এবং কন্যার বাল বিধবা হওয়া ও দেশের অন্যান্য বাল্য বিবাহের বিষময় ফল দেখিয়া বাল্য বিবাহের প্রতি তাঁহার অতিশয় ধিক্কার জন্মিয়াছিল।

আমাদের সুচতুর পাঠক পাঠিকাগণকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবেনা যে, এই আবদুল মতিন বিশ্বাসই পূর্ব্বোল্লিখিত আবদুল মতিন বিশ্বাস এবং আপনারা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে বালিকাটীকে দেখিয়া আসিয়াছেন সেইটিই রাহেলা, তৃতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চদশ বর্ষিয়া বালিকাই সফুরা খাতুন বা দুখী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জহুর উদ্দিন আহমদ আবদুল মতিন বিশ্বাসের মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া যাইবার পর আবদুল মতিন বিশ্বাসের জননী পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আবদু! জহুর অত বড় এবং অমন সুন্দরটা হয়ে উঠেছে তাত আমি জানি না। কি সুন্দর চেহেরা, রং যেন ফুটে পড়ছে! তোর সঙ্গে যখন পাঠশালায় পড়ত তখন ত তার চেহেরা এত সুন্দর ছিলনা। ছেলেটা দেখলেই যেন স্নেহ করতে ইচ্ছা হয়।"

আ।—আপনি অনেক দিবস হইতে দেখেন নাই তাই ওরূপ বোধ হইতেছে। আমিও প্রথমে দেখে সহসা চিনতে পারি নাই।

মা।—সত্যি বাবা, ছোট ছোট ছেলেরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে চক্ষের সামনে কেমন যে মানুষ হয়ে উঠছে। আচ্ছা এখন তাহারা কোথায় বাস করতেছে?

আ।—কামডোল গ্রামে।

মা।—সে গ্রাম এখান থেকে কত দূরে?

আ।—বেশী দূর নয়, এখান থেকে আট নয় ক্রোশ পশ্চিমে।

মা।—তার মা বেঁচে আছে কি?

আ।—হাঁ আছেন।

মা।—এখন তাদের অবস্থা কিরূপ?

আ।—অবস্থা ভালই বোধ হইল।

মা।—ভালই থাক বাবা, তারা পূর্ব্বেও ভাল ছিল তবে মধ্যে পদ্মাতেই তাদের সর্ব্বনাশ করে ছিল।

আ।—এখানে অবস্থা ভাল হইলেও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

মা।—কেন সে কি কথা?

আ।—এখনও তাহাকে সেই হাবা বিবিটি লয়েই সংসার করিতে হইতেছে।

মা।—আ—মা, সে হাবীটি কি বেঁচে আছেই!

আ।—(ইষদ্ধাস্তে) আপনি কি সেটিকে দেখিয়াছেন?

মা।—দেখব না কেন—সেখানকার বাড়ীতে থাকতে ত কতবার দেখেছি। ছি—ছি সেটিও কি মানুষ!

আ।—সেটি অমন কেন মা?

মা।—বাবা! কাল, ধল ত মানুষই হয়, কিন্তু সেটি আকেলেরই মারা ছি, অমন বৌ লয়ে কি আর ঘর করা চলে।

আ।—আচ্ছা চক্ষে দেখে অমন কলাগাছটীর সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়ে ছিল কেন?

মা।—বাবা, সব কপালের কথা। ছোট বেলায় বিয়ে হয়ে ছিল তখন কে জান ত যে সেটী অমন হুঁস পাতলা কলাগাছ হবে, তবে বৌ কাল এবং মুখ হাত ভাল নয় বলে তখনই অনেকে বাধা দিয়া ছিল; কিন্তু কুটুম্ব ভাল বলে সকল বাধা ঠেলে তার মা-ই আবদার করে বিয়ে দিয়ে ছিলেন। সেই আবদেরে বিয়ের ফলে যে ছেলেটাকে জনম জনম জ্বলতে হল।

আ।—বাস্তবিক তাহার জীবনটা অসুখেই যাইতেছে।

মা।—আচ্ছা তোরা ত রাত্রে অনেক কি কথা বলাবলি করতে ছিলি, সে এখন আর কোন নিকা-বিয়ে করতে চায় কি?

আ।—হাঁ করবেন। তিনি কতকটা সেই যোগাড়েই আছেন। আর এখন না করিলেও যে চলিবেনা।

মা।—এতদিন চলিল এখন চলিবেনা কেন?

আ।—এতদিন সকলে সঙ্গে ছিলেন—এখন পৃথক্ হইয়া গিয়াছেন।

মা।—ও তবে কি আর চলে, এখন কাজেই তাকে নিকা করতে হবে।

আ।—নিকা নিশ্চয় করিবেন, আমি তার পাত্রীও যোগাড় করিয়া দিতে চাহিয়াছি।

মা। হাঁ যখন ওবৌ-দ্বারা তার ঘর চলবেনা তখন দেখে শুনে একটা নিকা দেওয়াই ভাল। তা কার কথা বলব বাবা, আমার দুখীরই যে খোদা—। এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আ। আচ্ছা মা, আমাদের দুখীর নিকা তার সঙ্গে দিলে কেমন হয়?

পুত্রের কথায় জননীর মুখে অস্ফুট হাসির ক্ষীণ আভা বিকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, পাগল ছেলে, আমার দুখীকি ভারী হয়েছে তাই উপযাচক হয়ে তার হাতে তুলে দিতে যাবি।

আ। তা নয় তবে যদি তিনি প্রস্তাব করেন তাহা হইলে যেন, সে খানে নিকা দিলেই ভাল হয়। তাঁর ন্যায় সুন্দর এবং পরহেজগার পাত্র বিরল।

জননী একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন;—ছেলেটার বংশত বেশ ভাল—তবে সতিন আছে এই যা দোষ।

আ। তা থাক—সেটা আর দোষ কি! এই ত আপনারই দুইটী (পুত্র) বৌ। আর সেটী সতিন হইলেও কোনরূপ ভয়ের কারণ নাই।

মা। আচ্ছা প্রস্তাব করিলে দেখা যাবে। এই বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আবদুল মতিন বিশ্বাস ও তাঁহার জননী যে ঘর খানার দাওয়ায় বসিয়া কথা বলিতে ছিলেন সেই ঘর খানার সম্মুখস্থ অপর এক খানা ঘরে দুখী একেলাটী বসিয়া সুজনী কাঁথা সেলাই করিতে ছিল। বালিকা সুজনী সেলাই বন্ধ করিয়া উৎকর্ণ ভাবে সে সকল কথা শুনিতে ছিল। যখন তাঁহাদের কথা বলা শেষ হইল তখন সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার সুজনী সেলাই করিতে লাগিল।

ক্রমে দিনের আলো নিবিয়া রাত্রি হইল এবং দেখতে দেখতে রাত্রি প্রায় দশটা হইয়া গ্রাম নীরব হইয়া আসিল। এই সময় দুখী নৈশাহার সমাপনান্তে এশার নামাজ পড়িয়া তাহার মাতামহীর নিকট শয়ন করিল।

বালিকা সুকোমল ধবল শয়ন শয্যায় দেহলতিকা ঢালিয়া দিয়া নিদ্রা-দেবীকে আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু শান্তিদায়িনী তাহার অহ্বানের প্রতি কৃপা কটাক্ষ পাত করিলেন না। বালিকা যুগল লোচনাসন পাতিয়া অনেক কাকুতি মিনতি কত সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল, কিন্তু মা তবুও শান্তি দায়িনী, দুঃখতাপ বিনাশিনী, সর্ব্ব চিন্তা সংহারিণী আসিয়া তাহার লোচনাসনে অধিষ্টিতা হইলেন না। বালিকা কোন মতেই নিদ্রা-দেবীকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া অবশেষে একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

দৌহিত্রীর এতাদৃশ ভাব দর্শনে মাতামহী বলিলেন;—দুখী তুই আজি অমন কেন করতেছিস,—তোর কি কোন অসুখ করেছে?

দুখী বলিল;—আজি আমার একটু অসুখ বলিয়াই বোধ হইতেছে এবং কি জানি কেন মনও ধড়-ফড় করিতেছে—এত চেষ্টা করিতেছি তবুও ঘুম আসেনা।

মাতামহী রহস্য ভাবে বলিলেন;—হাঁ বুবু তোর অসুখেরই কথা। আচ্ছা প্রদীপটা নিবেয়ে দিয়ে চোখ বুঁদ এখনই ঘুম আসবে এবং ঘুম আসলেই সব সেরে যাবে।

দুখী বলিল;—নানী, তুমি ঠাট্টা, করিলে,—নিশ্চয় আজি আমার অসুখ বলিয়া বোধ হইতেছে।

মাতামহী বলিলেন;—আচ্ছা ভাই ভাল কথায় যদি ঠাট্টা করা হয় তা হলে আর তোকে কোন কথা বলব না। এই আমি ঘুমালেম। এই কথা বলিয়াই বৃদ্ধা ঘুমাইয়া পড়িলেন। দুখীও প্রদীপটা নির্ব্বাপিত করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল; কিন্তু না তাহার আর কোনমতেই ঘুম ধরেনা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দুখীর পঞ্চম বৎসর বয়ক্রম কালে তাহার পিতা তাহাকে একটা সৎপাত্রে অর্পন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভাগী বালিকা স্বীয় দুর্ভাগ্যদোষে অকালে তাহার সেই বালক স্বামীকে কালের করালগ্রাসে তুলিয়া দিয়া বিধবা হইয়াছে। তরুণমতি বালিকা বিধবা হইবার সময় স্বামীরত্ন যে কি অমূল্য রত্ন এবং বিধবার কপাল যে কি পোড়া কপাল তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারে নাই,—অথচ বুঝিবার কারণও ছিলনা। কিন্তু এখন সে সেকথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, তাই অনেক সময় নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিয়া থাকে; কিন্তু তাহার সে অশ্রুপাত এক বিশ্ববিধাতা ভিন্ন অন্য কেহই দেখিতে পায় না। দুখী এখন পঞ্চদশ বর্ষিয়া। এই সময় তাহার হৃদয় কন্দরে যে অনল অবিশ্রান্ত গতিতে ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে তাহা অন্যে কি বুঝিবে।

হৃথা তাহার জননীর অতি আদরের কন্যা এবং বাল বিধবা, তাই সে বিধবা হইলেও তাহার পরম স্নেহশীলা জননী একদিনের নিমিত্তও তাহাকে বিধবার বেশ ধারণ করিতে দেন না। সর্ব্বদাই নব বধূর ন্যায় নূতন নূতন বেশ ভূষায় বিভুষিতা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে সে একদিনের জন্যও সুখী হইতে পারে না।

হৃথীর ভাবীদ্বয় ও বৃদ্ধা মাতামহী ও অনেক সময় তাহার সঙ্গে অনেক প্রকার রহস্যালাপ করিয়া থাকেন, হৃথীও তাহাতে মৌখিক প্রফুল্লতা দেখাইতে ক্রটী করেনা। কিন্তু তাহাতেও সে কোন দিনের জন্য শান্তি লাভ করিতে পারেনা! হৃদয়ের ভাব হৃদয় বস্ত্রেই আচ্ছাদিত করিয়া রাখে।

অন্য বালিকার জ্বালাময় হৃদয়ে অনেক কথা জাগিয়াছে। জ্ঞান হওয়া অবধি তাহার ক্ষুদ্র জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমুদয়ই তাহার হৃদয় ফলকে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন আকাশের এক প্রান্তে মেঘ উঠিয়া ক্রমে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তদ্রুপ তাহার মনে প্রথমে এক ঘটনার কথা উদয় হইয়া ঘটনা পরম্পরায় সমগ্র হৃদয় খানি আবৃত হইয়া পড়িয়াছে; বিধায় তাহার নিদ্রা হইবে কেন? সে যে চিন্তায় বিভোরা।

বালিকা প্রথমে তাহার বালক স্বামীর কথা ভাবিতে লাগিল। স্মৃতির অস্ফুটালোকে মৃত পতির মনোহর দেহের গঠন ঈষৎ ভাবে ফুটিয়া উঠিল,—তাহার সেই সুন্দর হাঁসি ভরা হাঁসি হাঁসি মুখ খানি,—সুডোল দেহের গঠন,—জ্যোতিঃজড়িত চেহেরা,—সুমধুর বোল,—পরিচ্ছদের শোভা,—গমনের ভাব ইত্যাদি সবই তাহার চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া যাতনা-তপনের প্রখর কিরণে বালিকার কোমল-হৃদয় মরু-ভূমি খানি উত্তপ্ত হইয়া নয়ন যুগল হইতে কএক বিন্দু উষ্ণাশ্রু ঝরিয়া গোলাবী-গণ্ডদ্বয় চুম্বন করিল। বালিকা হৃদয় বেদনায় অস্থির

হইয়া বৃদ্ধার অজ্ঞাতসারে উপাধানে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফাঁফিয়া কাঁদিয়া শেষে একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ-নিশ্বাস ধীরভাবে ত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয় ভার লঘু করিল। হায় স্মৃতি! তুমি এমন করিয়া অবলা হৃদয় পোড়াও কেন?

বালিকা আবার তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার ভাবীদ্বয়ের হাবভাব, আমোদাহ্লাদ, হর্ষফুল্লতা, আঁচল দোলানী, গহণার ঝনৎকার, স্বামী-গৌরবে স্ফীত বক্ষে মরালগমন, পতি-ভক্তি, পতির উপর অভিমান, পতির নিকট হ্যানস্থ্যান আবদার, বঙ্কিম-নয়নের চটুল চাহনিতে ক্ষণে-ক্ষণে পতি ঈক্ষণ এবং তাহাদের প্রতি তাহার ভ্রাতার স্নেহ, অনুরাগ ইত্যাদি যে সময় যাহা দেখিয়াছে এবং দেখিয়া সে সময় তাহার অন্তঃকরণ যেমন ভাব ধারণ করিয়াছে সে সকল কথা ভাবিতে তাহার সরল অন্তঃকরণে থাকি দগ্ধিভূত হইয়া যাইতে লাগিল।

বালিকা সেই অবস্থাতে তাহার জনক জননীর কথা ভাবিল। তাহার স্নেহশালা জননী যেভাবে তাহার সুখ-সাচ্ছন্দতার প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিতেছেন, তাহাকে নিত্য নিত্য যে প্রকার বেশ ভূষায় বিভূষিতা করিয়া ঘর আলো করিয়া রাখিতেছেন,—সে যে বিধবা একথা তাহাকে আদৌ জানিতে দিবেননা—বিধবার বুকপোড়া জ্বালায় তাহাকে জর্জ্জরিত হইতে দিবেনা বলিয়া যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন,—সে যে তাহার নবনীর পুতুল,—সোহাগের লোলিত লতিকা,—যত্নের কমল ফুল,—রূপের ডালি,—আঁধারে আলো—তার যে কিসে আনন্দ হইবে,—কি করিলে মুখ কমলে সর্ব্বদা হাঁসির ফুল ফুটিয়া থাকিবে,—ফুলালক্ষে শাখিনী বালকের ন্যায় পলক দিয়া বেড়াইবে এসকল বিষয় তিনি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং সে যে জননীর সে সকলে যোটেই সুখী

হইতে পরিতেছেনা ; জননী কেনই-যে তাহার মর্ম্মান্তিক যাতনা নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন না ?

পিতা জীবিত কালে যেরূপ স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশায় তাহার নিকাহের নিমিত্ত যতগুলি প্রস্তাব আসিয়াছিল এবং পিতা সে সকল প্রস্তাব যে যে ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এই সকল কথা ভাবিয়া একটী বুকভাঙ্গা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক তাহার ভ্রাতার কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

হায় ! দুঃখীর মুখের প্রতি কি কেহই তাকাইতে জানেনা ? পিতার মৃত্যু হইবার পর ভ্রাতার নিকটও অনেক প্রস্তাব আসিতেছে,—সে-যে ডাকের সুন্দরী এবং সর্ব্বগুণে বিভূষিতা হইয়া লক্ষ্মীপুর আলো করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার হওয়ায় অনেক ভাল ভাল ঘরের সুন্দর সুন্দর যুবকবৃন্দ তাহার কৃপাকটাক্ষপাতের নিমিত্ত লালায়িত,—একথা সে অনেকাংশে জানিতে পারিয়াছে ; কিন্তু হায় ! কেনই যে আবদুল মতিন বিশ্বাস তাহার নিকাহের প্রতি উদাসীন ?

ঈদৃশ নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে বালিকার অন্তঃকরণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে আবার উপাধানে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফাঁফিয়া কাঁদিল। হায় ! এ পাপ তাপপূর্ণ সংসারে মানুষ যদি মানুষের মনের কথা হৃদয়ের দুঃখ বুঝিতে পারিত তাহা হইলে বোধ হয় ধরা বক্ষে এত অশান্তি থাকিত না।

পাগলের পাগলামীর গতি এবং চিন্তকের চিন্তার গতি কখন যে কোন মুখে, কোন পথে প্রধাবিত হয় তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না—পারিবেওনা—সহসা বালিকার চিন্তা পটে জহুরুদ্দীনের মনোহর মূর্ত্তি খানি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। বালিকা এবার সেই মূর্ত্তি খানির মুখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহারই জীবনীর পর্য্যালোচনা আরম্ভ

করিল। বিগত রজনীতে কপাটের আড়ে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যে সকল কথা শুনিয়াছিল এবং দিবা ভাগে মাতা ও ভ্রাতার কথোপকথনে যে সকল কথা অবগত হইয়াছিল সেই সকল কথা মনে হওয়াতে হতভাগ্য জহুরুদ্দীনের প্রতি তাহার কতই না দয়ার সঞ্চার ও করুণার উদ্রেক হইতে লাগিল। বালিকা বলিল "হায়! আমি যেমন বুকভরা জ্বালা লইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, তুমিও সেইরূপ হৃদয় ভরা অশান্তি লইয়া জীবন ভার বহন করিতেছ।"

স্মৃতি! তুমি দুঃখের আকর এবং সুখেরও খনী। যখন তুমি মানব হৃদয়ে দুঃখানল জ্বালিয়া দাও তখন মানবের নিকট দুঃখের আকর; আবার যখন সেই মানব হৃদয়ে সুখ বহন করিয়া দাও তখন তুমি সুখের খনী। এবার বালিকার চিন্তা পট একটু পরিবর্ত্তিত হইল। ভ্রাতার বাক্য;—"আমাদের দুখার নিকা তার সঙ্গে দিলে কেমন হয়" এবং জননীর বাণী, "প্রস্তাব করিলে দেখা যাবে" স্মৃতি এই বাক্যদ্বয় তাহার হৃদয়ে আনিয়া দিল। ইহাতে বালিকার করুণা ভালবাসায় পরিণত হইয়া পুনরায় সেই মূর্ত্তিখানি নূতনভাবে, নবীন-দমকে নবীন চমকে তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল তাহাতে কোমল মতি সরল হৃদয় বালিকা যেন কি এক রকম হইয়া গেল।

বালিকা আত্মহারা হইয়া জহুরুদ্দীনের রূপ-রাশিও বাক্য-মাধুর্য্যে দেহ প্রাণ ডুবাইরা হৃদয়-ফলকে কতই না আশা মূর্ত্তি গড়িতে লাগিল, এবং তাহাতে তাহার লাবণ্যভরা শীরীষ দেহলতিকা খানি থাকিয়া থাকিয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে লাগিল।

চিত্তহারিণী বালিকা কল্পনা তুলিকায় মনস পটে যতই আশা মূর্ত্তি অঙ্কন করিতে লাগিল, আকাঙ্ক্ষা শশাঙ্কের সুস্নিগ্ধ কিরণে ততই তাহার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল। মুগ্ধা বালিকা এইরূপে বহুক্ষণ চিন্তা করতঃ

কি যেন বুঝিয়া সহসা উঠিয়া বসিল। তৎপর প্রদীপটা ধরাইয়া একটা জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরভাবে কপাট ঠেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বালিকা যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া যায় তখনও ত্রয়োদশীর রজব-চন্দ্র আকাশ আসনে বসিয়া কৌমুদী রাশিতে ধরাতল প্লাবিত করিতে ছিল। নভঃমণ্ডলে অসংখ্য তারকা রাজি ঝিক-ঝিক্ করিয়া জলিয়া জলিয়া উজ্জল জ্যোতিঃপুঞ্জ ঢালিয়া দিতেছিল। বাটির পার্শ্ববর্ত্তী বিটপিচয় জ্যোৎস্না বন্যায় স্নাত হইয়া স্থানে স্থানে মাথা তুলিয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। জ্যোতিরঞ্জিত কীট সমূহ জ্যোৎস্না প্লাবনে আনন্দে সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছিল। জলদাগমের মৃদুমারুত পাতা নাড়িয়া, ফল ফুল দোলাইয়া ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতেছিল। যেদিকে দেখা যায় সেইদিকে সৌন্দর্য্য মাখা—শান্তিলেপা। বালিকা প্রকৃতির এই মনোহরদৃশ্য মধ্যে দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ওজু করিতে বসিবে এমন সময় বাটির উত্তর পার্শ্বের আম্রবাগানে কে গাহিয়া উঠিল :—

তুমি সবারি অতুল বসন্তেরি ফুল
ফুটিলেবিশ্ব মাতিয়া—
আমি পূত প্রেম-ভরে মধুপান ক'রে
লইব তোমায় চুমিয়া।
তুমি কোকিল কুজনে ভ্রমর গুঞ্জনে
হৃদয়ে উঠিলে গাহিয়া—
আমি ঢালি ক্ষুদ্রপ্রাণ শুনি তব গান
আনন্দে উঠিব মাতিয়া।
মি সান্ধ্যতারা হ'য়ে মিটি মিটি চেয়ে
আকাশে উঠিলে হাঁসিয়া—

আমি শ্যামল শয্যায় শুইয়া তোমায়
প্রেম-ভরে লিব চাহিয়া।

গায়ক বোধ হয় আমবাগানের প্রহরী। সে এই পর্য্যন্ত গাহিয়াই থামিয়া গিয়া 'ঢন্ ঢন্' করিয়া টিন বাজাইয়া বাতিল-পক্ষী তাড়াইতে লাগিল। এদিকে বালিকা বুকে হাত চাপিয়া ওজু করিতে বসিল।

বালিকা ওজু ক্রিয়া সমাপন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তৎপর এক খানা জায়নামাজ বিছাইয়া দুই রেকাত নামাজ পড়িয়া এক খানা সুন্দর মলাটের কোরআন শরিফ লইয়া ভক্তি-ভরে চুম্বন করতঃ পাঠ আরম্ভ করিল।

এই সময় তাহার মাতামহী নিদ্রা হইতে জাগিয়া দৌহিত্রীর প্রতি চাহিলেন; কিন্তু কিছু না বলিয়াই পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন দুখী প্রায়ই নিশিথ কালে এইরূপ কোরআন শরিফ পড়িয়া থাকে!

বালিকা প্রায় একঘণ্টা কাল কোরআন সরিফ পাঠ পরিয়া জুজদানে বন্দ করতঃ দুই হস্ত তুলিয়া মোনাজাত করিতে লাগিল, কিন্তু অন্তকার মোনাজাত তাহার সাধারণ মোনাজাত নহে—মোনাজাতে মনের ভাব হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল এবং নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারে অশ্রুরাশি গড়াইয়া বক্ষঃবসন আর্দ্র করিতে লাগিল।

বালিকা এইরূপে মোনাজাত শেষ করিয়া পূনর্ব্বার কোরআন শরিফখানি চুম্বন করিয়া যথাস্থানে স্থাপন পূর্ব্বক প্রদীপটা নির্ব্বাপিত করিয়া শয়ন করিল; কিন্তু সে রাত্রিতে তাহার ঘুম হইয়াছিল কি না তাহা আমরা অবগত নহি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুবতী বালিকার কেশ-বিন্যাস ক্রিয়া শেষ করিয়া বলিল;—আজি ভাই একটা মোটা বখসিস চাই—তা তুমি বখসিস বুঝ বা ভিক্ষাই বুঝ।

বা।—না ভাই আজি ভিক্ষা শিক্ষা কিছুই দিতে পারিব না।

যু।—কেন মন খারাপ?

বা।—পোড়ামুখি।

যু।—আচ্ছা বল দেখি ভিক্ষুককে কি শূন্যহাত ফিরাইতে আছে?

বা।—(ঈষদহাস্যে) কেন ফিরাইলে কি হয়?

যু।—তুমিই না একদিন বলিয়াছিলে—দ্বারে আসিয়া কেহ যদি কিছু চাহে তাহা হইলে তাহাকে শূন্যহাতে ফিরাইতে নাই, কিছু দিতে না পারিলেও দু'টা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে হয়। যাহাতে প্রার্থীর মনে কষ্ট হয় এমন কিছুই বলিতে বা করিতে নাই। তা তুমি যাহাই বল, কিন্তু এ ভিখারিণী কিছু না লয়ে উঠছে না।

বা।—এ ত ভাই কঠিন ভিখারিণী! আচ্ছা বল তুমি কি চাও?

যু।—তুমি যে গতকল্য ফকিরের বিষয় কথা বলেছিলে তাহাতে আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে;—যাহারা একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে 'দাও দাও' বলিয়া জিকির ছাড়িয়া বেড়ায় তাহাদের আবার আদর কি?

বা।—প্রশ্ন বেশ! আচ্ছা শুন তোমাকে একটু দূরদিয়া বুঝাইতেছি।

যু।—তাহাই চাই।

বা।—দান করিলে যে কিরূপ ফল পাওয়া যায় তাহার একটা দৃষ্টান্ত শুন ;—ভূমিতে একটা ধানের বীজ পুঁতিয়া দিলে তাহাতে একটা গাছ হইয়া হয় ত তাহাতে সাতটী শাখা হয় এবং সেই সাতটী শাখাতে সাতটী শীষ হইয়া আবার প্রত্যেক শীষে একশত করিয়া ধান ধরিয়া সাতশত ধান হয় ইহার অধিকও হইতে পারে। এই যেমন মাত্র একটী ধানে সাতশত বা ততোধিক ধান হইল তদ্রূপ সৎকার্য্যে যে কোন বস্তু দান করিলে পরকালে সেই বস্তুর সাতশতগুণ বা ততোধিক নেকী পাওয়া যাইবে। ইহা কোরআন শরিফের কথা এই প্রকার হাদিছেও না কি দানের গুণ বর্ণিত হইয়াছে। একদিন আমাদিগকে পড়া বুঝাইবার সময় মৌলবী সাহেব বলিতেছিলেন ;—"হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে—সৎ-কার্য্যে একটী পয়সা দান করিলে পরকালে 'ওহদ' পাহাড়ের তুল্য নেকী পাওয়া যাইব।" এখন বুঝিলে সৎকার্য্যে সামান্য দান করাও কিপ্রকার নেকী,—তবে ইহার মধ্যে একটা কথা আছে—ধর আমি মাত্র একটী পয়সা দান করিব ; কিন্তু দিব কাকে ?

যু।—কেন কোন ফকির মিস্কিন কে ?

বা।—ধরিয়া লও এদেশে বা এজেলায় ফকির মিস্কিন নাই।

যু।—তবেই ত মুস্কিল—ফকির মিস্কীন না থাকিলে কাহাকে দেওয়া যাইবে।

বা।—তাহা হইলে সে পয়সাটী দান করা হইল না।

যু।—কাজেই হইল না।

বা।—কেবল ভিক্ষুকের অভাবেই না দানের অতবড় নেকী হইতে বঞ্চিত হইলাম।

যু।—হাঁ।

বা। এখন বুঝিয়া দেখ 'দান' 'দাতা' 'গৃহীতা' দান কার্য্যে এই

তিনটীর সমান প্রয়োজন। ইহার একটীর অভাবে দান কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। তবে এখন প্রমাণ হইল একদিকে যেমন দাতা বড় অন্য দিক্‌দিয়া গ্রহিতাও তদ্রূপ; বল ইহা হয় কি না?

যু।—নিশ্চয়।

বা।—তবে বল দাতাগণ ভিক্ষুকের সম্মান করিবেনা কেন? ধরিতে গেলে তাহারাইত দাতাগণের নেকী হাসেলের প্রধান সহায় এবং বেহেস্তে যাইবার সোপান। এই নিমিত্ত খোদাতায়ালা কোর-আন শরিফে বলিয়াছেন, "ভিক্ষুকের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিও না।

যু।—কথা সত্যই বুবুজান।

বা।—আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখ—সহজেই কি কেহ অন্যের দ্বারে 'দাও' বলিয়া হাত পাতিতে যায়? যখন অভাবের তীব্রতাড়না এবং জঠর জ্বালার কষাঘাত অসহ্য হইয়া উঠে তখনই মানুষ কুল, মানে জলাঞ্জলি দিয়া—লোকলজ্জার মাথা খাইয়া অন্য মানুষের দ্বারে যাইয়া হাত পাতে। এই ধরণের মানুষকে কিছু না দিয়া অথবা দু'টা মিষ্ট কথায় তুষ্ট না করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া বা তাহার প্রতি কোন প্রকার কটূক্তি ব্যবহার করা ঘোর অন্যায় এবং মনুষ্যত্বের গর্হিত কার্য্য। গরীবের দুঃখে যাহার দুঃখ হয় সেই ত মানুষ—সেই ত মহান। গরীবকে ভাল না বাসিয়া কেহ কোন কালে বড় মানুষ হইতে পারে নাই। শুনিয়াছি আমাদের নবি সাহেব দোওয়া করিতেন;—"হে আল্লা! আমার জীবন, মরণ এবং পরকালে কবর হইতে উত্তোলন মিস্কীনের সঙ্গে করিও।" তাঁহার এই দোওয়া খোদা কবুল করিয়াছিলেন তাই নাকি তিনি জীবনে কখনও উপর্য্যুপরি দুই দিবস উদর পূরিয়া আহার করিতে পান নাই। যদিও খোদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন;—"তোমার ইচ্ছা হইলে এই মক্কার পর্ব্বত শ্রেণীকে তোমার নিমিত্ত সোণা করিয়া দেই।"

যু।—আচ্ছা বুবুজান! তিনি ইচ্ছা করিয়া মিস্কীনী চাহিয়াছিলেন কেন?

বা। একথার প্রশ্ন তখনই নাকি নবি সাহেবের প্রিয়তমা পত্নী বিবি আয়েসা সিদ্দিকা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন ;—"ধনবানদের চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেই মিস্কিনগণ বেহেস্তে যাইবে।" এবং পরিশেষে হজরত আয়েসা বিবিকে বলিয়াছিলেন ;—"আয়েশা! তুমি কখনও মিস্কীনকে (শূন্যহস্তে) ফিরাইয়া দিও না। যদিও তোমার নিকট একটী মাত্র খেজুরের কিয়দাংশ থাকে। আয়েশা! তুমি মিস্কীনগণকে ভাল বাসিও এবং নিকটে (স্বীয় মর্য্যাদার নিকটে) স্থান দিও তাহা হইলে কিয়ামতের দিন খোদা তোমাকে নিকটে স্থান প্রদান করিবেন।"

যু।—হাদিসের কথা কি সুন্দর! শুনিলেই প্রাণ জুড়ায়। আচ্ছা বুবুজান! আমাদের পাড়ার তমিজের মা কি এসকল কথা শুনে নাই? সে ভারি খারাপ মানুষ—বড় বদমেজাজে মেয়ে। সেদিন তাহাদের বাড়ী দুইটী ছোট ছেলে সঙ্গে করিয়া একটা ভিক্ষারিণী আসিয়াছিল। তাহার কথা মনে হইলে এখনও আমার মন যেন কেমন হইয়া উঠে। ধরিতে গেলে সে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছিল। তাহার পরণে মাত্র একখানা ছিঁড়া ও ময়লা কাপড়। সে কাপড় খানায় শরীরের একদিক ঢাকিতে গেলে অপর দিক্ উলঙ্গ হইয়া পড়ে। কি কষ্টেই যে, সে ইজ্জত ঢাকিয়া বেড়ায় তা খোদা তালাই জানেন। আর ছেলে দু'টীও একবারেই উলঙ্গ। সে তমিজের মার নিকটে যাইয়া মিনতি করিয়া বলিল ;—'মা আমরা বড়ই দুঃখিনী —আমার এই মেয়ে দু'টী রাত হইতে কিছু খায় নাই—এই এতিম দু'টীর জন্য কিছু ভিক্ষা দাও।" এইকথা শুনা মাত্রই তমিজের মা তাদেরকে 'দূর দূর' করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল এবং তৎসঙ্গে এমন কএকটী কথা বলিল যে তাহা বোধ হয় মরা মানুষের গায়েও সহ্য হয় না। হায়! সে যখন চক্ষের পানি মুছিতে মুছিতে ছেলে

হু'টার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যায় তখন আমার কলিজা চড়্‌চড়্‌ করিয়া উঠিয়াছিল। আমি তখনই বাড়ী আসিয়া মাজানকে (শাশুড়ী) বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভিক্ষারিণীকে ডাকাইয়া একখানা পুরাতন কাপড় এবং একসের চাউল ও চারিটী পয়সা দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। ভিক্ষারিণীটী হিঁদু না হইলে বোধ হয় তাহাদিগকে উদর পূরিয়া আহার করাইতেন। হায় আল্লা! তমিজের মাও কি মানুষ?

বা।—ভাই, আমাদের অশিক্ষিত মেয়ে-মহলে এইরূপ কতদোষ যে আছে তাহা বলাই বাহুল্য। আচ্ছা ভাই আজিকার মত থাক। আর বেলা নাই নামাজের সময় হইয়া আসিল।

নবম পরিচ্ছেদ ।

আমাদের পূর্ব্বকথিত জঙ্গীপুরের অনতিদূরে পিরোজপুর গ্রাম। এই গ্রামে আদালত মণ্ডল নামক জনৈক মধ্যবিৎ অবস্থার গৃহস্থ বাস করিতেন। আদালত মণ্ডলের পাঁচটী পুত্র সন্তান। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রের নাম জহুরুদ্দীন আহমদ। জহুরুদ্দীনের ষষ্ঠবৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার পিতা তাহাকে গ্রাম্য-পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেন। এই সময় হইতেই তাহার জননী অতি আদরের কনিষ্ঠ-পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত আবদার ধরেন। কর্ত্তাসাহেব অনেক বাধা দিয়াও গৃহীণীকে নিরস্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে জহুরুদ্দীনের পাঠশালায় ভর্ত্তি হইবার ছয়মাস পরই রসুলপুর গ্রামে তাহার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। পাত্রীটী সে সময় তিনবৎসরের মাত্র। পাঠক পাঠিকা ! আপনারা বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন এ বিবাহ পাত্র পাত্রীর মনের বিনিময়ে হইল না, উভয়ের জনক জননীর মনের মিলনেই হইয়া গেল ; কিন্তু আপনারা মনে রাখিবেন এ বিবাহের পাত্রটী বেশ সুন্দর, কিন্তু খুকী বধূটী এক রকম।

সময় কারু উপরোধ অনুরোধ শুনে না। সে নিয়ত আপনার একটানা গতিতে চলিয়া যাইতেছে—চলিয়া যাইবেও। দিনের পর দিন আসিয়া জহুরুদ্দীন একবিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। বধূটীও সপ্তদশ বর্ষিয়া হইয়া উঠিয়াছে। বালিকা বধূটী কেমনই হউক না কেন ; কিন্তু যখন সে যৌবন সীমায় পদার্পণ করে এবং তাহার যৌবনচিহ্নগুলি একযোগে

মাথা তুলিয়া স্বস্থান অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান হয় তখন তাহার রূপ প্রভায় জগৎ আলো না করিলেও যৌবন লাবণ্যে অবশ্যই এক আধটুকু মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু জহুরুদ্দিনের বিবাহের পর এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশবৎসর কাল অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, এই দীর্ঘকাল মধ্যে তিনি স্বীয় পত্নীকে একদিনের জন্যও শুভদৃষ্টিতে দেখেন নাই। তাহার এই ব্যবহারে ভিতরে ভিতরে অনেক কথা হইতে লাগিল; কেহ জহুরুদ্দীনের দোষ, কেহ বধূটীর দোষ, কেহ উভয়ের মাতা পিতার দোষ, কেহ-বা তাহাদের অদৃষ্টের দোষ দিয়া নানাজন নানাস্থানে গুজব করিতে লাগিল। বধূটীর জনক জননী এবং আত্মীয়গণও খেদানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। জহুরুদ্দীনের মাতা পিতা ও পুত্রের এতাদৃশ ব্যবহারে যারপর নাই দুঃখীত হইয়া পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু ফল কিছুই হইল না। বধূটী কোন মতেই পতির মনমত হইয়া উঠিল না।

জহুরুদ্দীন সুন্দর যুবা। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া কিছু শিক্ষাও পাইয়াছেন এবং তিনি সামান্য গৃহস্থ-সন্তান হইলেও সভাগুণে বেশ সভ্য হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বেশ চরিত্রবান যুবক। সংসারের সুখ শান্তি এবং দুঃখ তাপ যে বস্তুর উপর নির্ভর করে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। গৃহিণীই যে একমাত্র সংসারের সার, সেই গৃহিণী আদর্শ না হইলে সংসার যাত্রা বিড়ম্বনা মাত্র এবং ইহলোক ও পরলোকে সুখের আশা দুরাশা তাহাও তিনি সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বলিতেগেলে মানুষ রূপ ও গুণের আদর করিয়া থাকে, তবে যদি এই দুইটী একাধারে পাওয়া যায় তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। তাহার পত্নী যে উল্লিখিত উভয় বিষয়ই বিবর্জ্জিতা। তিনি পত্নীকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে পথ দেখাইতে

পারেন নাই। এমন কি শেষে নামাজ পর্য্যন্ত পড়াইতে পারেন নাই অন্য শিক্ষা ত দূরের কথা। বিধায় এহেন পত্নীর প্রতি তাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে। ইতোমধ্যে তিনি আর একটা বিবাহ করিবেন বলিয়া ভিতরে ভিতরে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেহাই বেহাইন ভাল, ঘর এবং বংশ ভাল, বৌ কাল হইলে কি হইবে, কাল, ধল ত মানুষই হয়; পরন্তু আর একটা বৌ আসিলে রাতদিন বাড়ীতে ঝগড়া হইবে, এমন সুখ শান্তি পূর্ণ সংসারে অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে; পক্ষান্তরে ইহাতে স্ব-হস্তে পুত্রের নানাবিধ বিপদের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রকার নানাবিষয় আলোচনা করিয়া কর্ত্তা সাহেব ও গৃহিণী সাহেবা কোনমতেই পুত্রের পুনঃ বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে জহুরুদ্দীন নিরুপায় হইলেন বটে, কিন্তু নিরাশ হইলেন না।

এইকালে পদ্মানদীর ভাঙ্গান আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ আদালত মণ্ডলের পুরাতন বাটীখানা পদ্মাগর্ভে পতিত হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু নদীর উপর ত আর কারু জোর চলে না। অগত্যা তিনি সেস্থান হইতে বাবলাবনা নামক স্থানে বাটী স্থানান্তরিত করিলেন। সেই বৎসরই সকল ভূসম্পত্তি কৃতিনাশার গর্ভে পতিত হইল।

বাবলাবনায় একপ্রকার কালকাটা বাটী প্রস্তুত করিয়া কর্ত্তাসাহেব সেখানে জমিজমা ক্রয় করিবার নিমিত্ত পুত্রগণের মতামত গ্রহণেচ্ছায় একদিবস সকল পুত্রকে একত্রিত করিয়া তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাহাদের মতের ঐক্য হইল না। একপক্ষ সেখানেই জমিজমা ক্রয় করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন এবং দ্বিতীয়পক্ষ সেখানে থাকিবেন না বলিয়া বাড়িয়া জওয়াব দিলেন। কারণ সেস্থান স্বাস্থ্যকর নহে; পরন্তু সেখানে ফসলাদিও ভাল জন্মায় না। পদ্মাপারের

টাল (১): অঞ্চলে এখানকার অনেক লোক যাইয়া জমি জমা লইতেছে সুতরাং তাঁহারাও যাইয়া সেখানে জমিজমা লইবেন। জহুরুদ্দীন বাবলাবনায় বাস করিতে কোনমতেই সম্মতি প্রদান করিলেন না। কিন্তু কর্ত্তাসাহেব যে ক'টা দিন বাঁচিয়া থাকিবেন সে পর্য্যন্ত আর কোথাও যাইবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করায় জহুরুদ্দীনের পক্ষিয়গণ নিরুপায় হইলেন। শেষে সেখানেই কিছু কিছু জমিজমা ক্রয় করিয়া কোনরূপ কষ্টে স্বষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহারও মনে শান্তি হইল না।

বাবলাবনা প্রস্থানের অল্পদিবস পরই কর্ত্তাসাহেব মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পিতার মৃত্যু হইবার পর জহুরুদ্দীন আর একবার বিবাহ করিবার কথা উত্থাপন করিলেন; কিন্তু এবারও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তাহার ভ্রাতাগণ একগুঁয়ে হইয়া বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে জহুরুদ্দীন বুঝিলেন তাঁহার ভ্রাতাগণও তাঁহার মনের অশান্তি দূর করিতে সম্মত নহেন। তবে আর সংসারে কে আছে তাহার? বিধায় সে সকলের আশা ত্যাগ করিয়া সেই জগত্তারণ বিপদবারণ দয়াময় আল্লাহ-তাআলার নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া তাহারই সাহায্য ভিক্ষা করণ মানসে সেই দিবস হইতেই প্রত্যহ শেষ রাত্রিতে তহজ্জুদের নামাজ পাঠান্তে স্বীয় মনস্কামনা পূরণ হেতু মোনাজাত করিতে আরম্ভ করিলেন।

আদালত মণ্ডলের মৃত্যু হইবার পরও তাহার পুত্রগণের মতের অনৈক্য বিদূরিত হইল না। একপক্ষ অকাতরে অন্নকষ্ট সহ্য করিবেন পীড়ায় জর্জ্জরিত হইবেন তথাপিও সেস্থান ত্যাগ করিবেন না এবং

(১) পূর্ব্বে মহানন্দা নদী পশ্চিমে কাটিহার উত্তরে বরবা এবং দক্ষিণে কালীন্দ্রীনদী। এই চৌহদ্দিবিশিষ্ট স্থান এ অঞ্চলে 'টাল' নামে অভিহিত।

অগ্রজ পক্ষ আর কোন মতেই সেখানে থাকিবেন না বলিয়া মহাগোল যোগ বাধাইয়া তুলিলেন; কিন্তু জহরুদ্দীন কোনমতেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে একদিন অমানীগঞ্জের হাটের নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক টাল অঞ্চলে পৌঁছিয়াছিলেন এবং অনেক স্থান পরি ভ্রমণ করিয়া শেষে মধুপুর পরগণায় কামডোল নামক মৌজায় কিছু জমির চৌহদ্দী স্থির করিয়া বাটী ফিরিলেন।

জহরুদ্দীন বাটী আসিয়া জমিজমার কথা প্রকাশ করিলে গ্রামস্থ অনেক লোকই সেখানে যাইতে প্রস্তুত হইল; অগত্যা তাঁহার ভ্রাতাগণও আর স্বীকার না হইয়া পারিলেন না। অতঃপর তাঁহারা সেই বৎসরই বাবলাবনা ত্যাগ করিয়া উল্লিখিত কামডোল মৌজায় যাইয়া বাসস্থান স্থাপন পূর্ব্বক জমি চাষ আবাদ করিতে লাগিলেন। জমিতে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হইতে লাগিল, ইহাতে দুইবৎসর মধ্যেই তাঁহাদের গৃহস্থালী প্রায় দ্বিগুণ কলেবরে গঠিত হইল। এতদিনে তাঁহাদের অন্নকষ্ট ও গৃহের অশান্তি দূর হইল; কিন্তু জহরুদ্দীনের মনের অশান্তি স্বস্থান পরিত্যাগ করিল না।

এই স্বচ্ছন্দতার সময় জহরুদ্দীন বন্ধু-বান্ধব দ্বারা আর একবার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন; কিন্তু এবারও ফল পূর্ব্বের ন্যায় হইল। তাহার অগ্রজগণ কোন মতেই ভ্রাতৃজায়ার সতিন করিয়া দিতে সম্মত হইলেন না। অগ্রজগণের এই পাষাণ ব্যবহারে জহরুদ্দীন তাঁহাদের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। ইহার কিছুদিন পর তাঁহাদের বাটীতে আর এক অশান্তির লক্ষণ দেখা দিল,—সেটা গৃহলক্ষ্মীদের রণ। রণাঙ্গনাদের এই গৃহযুদ্ধের ফলে সংসার আর টিকিল না, সেই বৎসরই তাঁহারা পৃথক হইয়া গেলেন, কেবল জহর উদ্দিন ও তদাগ্রজ শাকরুদ্দিন একত্রে থাকিলেন। হায় গৃহলক্ষ্মী

—রণাঙ্গণাগণ! তোমাদের গৃহরণের ফলে কত সোণার সংসার যে শ্মশানে পরিণত হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

তাঁহাদের সংসার পৃথক হইবার পর কে কিরূপ সুখী অসুখী হইল তাহা বলা যায় না। কিন্তু জহুরুদ্দীন আর এক নূতন বিপদে পড়িলেন। কেন-না তাঁহার স্ত্রীটী একে ত দেখিতেই কিম্ভুতকিমাকার তাহাতে আবার গৃহকার্য্যে আদৌ নিপুণা নহে। এত দিবস সে রান্নাপাকের কোন কার্য্য না দেখিয়া কর্ত্রীর ফরমায়েসমত কেবল বাহিরের কার্য্যই করিত; কিন্তু এখন আর তাহা চলিল না, সংসার পৃথক হইবার পর তাহারা দু'টীকে গৃহস্থালী সকল কার্য্যই দেখিতে হইল। বাটীতে যেদিন শামসুদ্দীনের স্ত্রী রান্না করিত সেদিন কোন কথাই হইত না; কিন্তু যেদিন জহুরুদ্দীনের পত্নী রান্না করিত সেদিন বাটীতে নানাপ্রকার অশান্তির লক্ষণ দেখা যাইত। ছোটবৌএর হাতের রান্না খাইয়া বাটীর উচ্চশ্রেণী হইতে চাকর বাকর পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইত। ইহাতে জহুরুদ্দীনের দুঃখের পরিসীমা থাকিত না।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আপনারা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই জহুরুদ্দীনই আমাদের কথিত জহুরুদ্দীন আহমদ এবং আপনারা প্রথম পরিচ্ছেদে যে যুবকটীকে দেখিয়া আসিয়াছেন সে যুবক ও এই জহুরুদ্দীন ভিন্ন অন্য কেন কেহই নহেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

যে ষ্টেশনটীর পাণ্ডুয়া নাম পরিবর্ত্তন হইয়া আধুনা একলক্ষী নাম হইয়াছে, সেই ষ্টেশন ও সামসী ষ্টেশনের ঠিক মধ্যভাগের অনুমান তিন মাইল দক্ষিণে কামডোল নামক বিল। বিলটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে—উত্তর দক্ষিণভাগে লম্বা। এই বিলে সেরূপ দলদাম নাই। বিলটি অনাবিল বারিরাশি বুকে করিয়া নিয়ত আনন্দে ঢল ঢল করিতেছে। বিলের পূর্ব্ব পাড়ব্যাপিয়া ক্রোশাধিক লম্বা কামডোল গ্রাম। গ্রাম খানি অধিকদিনের পুরাতন নহে বলিয়া তাহাতে কোন প্রকার ফলবান বৃক্ষও দেখা যায় না; তবে পূর্ব্বপাড়ে কতকগুলি পুরাতন শাল্মলী তরু দেখা যায় মাত্র। গ্রামের অধিবাসী দুই একঘর নমঃশূদ্র ব্যতীত সকলই মুসলমান। এই কামডোল গ্রামেই জহুর উদ্দিনের বাসস্থান।

লক্ষীপুর হইতে বহির্গত হইয়া চৌঠা আষাঢ় মঙ্গলবার অপরাহ্ন বেলা চারিটার সময় জহুরুদ্দীন মঙ্গলমতে বাড়ী পৌছিলেন। তিনি বাটী পৌছিতেই বাটীর মেয়ে, ছেলেরা "বাবা সন্দেশ কই, চাচা মুলী-মুলকী দাও।" বলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। তিনি ছেলেদের জন্য যাহা খাবার সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা বালক-বালিকাগণের হাতে দিয়া স্বীয় শয়নঘরে যাইয়া কাপড় ছাড়িলেন। তৎপর একজোড়া কাষ্ঠ-পাদুকা হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডায় বসিলেন। তাঁহার বাটী আসা প্রায় দশ বার মিনিট হইয়াছে এই সময়টুকু মধ্যে বাটির কতিপয় বালক বালিকা ব্যতীত অন্য কেহই আসিয়া তাঁহাকে

কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। তাঁহার জননী বাটীতে ছিলেন না। পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি এই সময় বাড়ী আসিয়াই পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা কখন আসিলে—অমন হ'য়ে বসে আছ কেন—কোন অসুখ করেছে কি ?

জহুরুদ্দীন বলিলেন, "না অসুখ করে নাই তবে এই রৌদ্রে ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া আসিলাম তাই শরীরটা বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

জননী পুত্রকে আর কোন কথা না বলিয়া "ছোট-বৌ ছোট-বৌ" বলিয়া ডাকিলেন। তাঁহার ডাক শুনিয়া পূর্ব্বাদ্বারি ঘর হইতে ময়লা কাপড় পরিহিতা একটী রমণী মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। বলা বাহুল্য এই রমণী মূর্ত্তি বা ছোট-বৌ-ই জহুরুদ্দীনের স্ত্রী।

কর্ত্রী-একটু গরম কথায় বলিলেন, "হাঁরে মা তোর কি আদব আক্কিল, এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? আমার ছেলে রোদ মাথায় করে এসে কতক্ষণ হ'তে বসে আছে আর তুই তাকে পা-ধুতে একটু পানিও দিস নাই। মা' তোকে ল'য়ে জলতে জ্বলতেই জনম গেল। পোড়ারমুখি জলদি পানি দে।"

শাশুড়ীর তিরস্কারবাক্যে বধুটি মুখখানা ভারী করিয়া একঘটি জল আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। জহুরুদ্দীন বিরক্তভাবে জলের পাত্রটী লইয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিলেন।

অতঃপর জননী বলিলেন "বাবা কিছু খাওয়া হয়েছে কি ?" জহুরউদ্দিন বলিলেন "হয়েছে।" জননীর মন কিন্তু বুঝিল না। তিনি উঠিয়া স্বহস্তে খাবার আনিয়া পুত্রকে আহারে বসাইলেন। জহুরউদ্দিন অল্প কিছু আহার করিয়া আসরের নামাজ পড়িবার নিমিত্ত মসজিদের দিকে চলিয়া গেলেন।

সোমবার দিবা প্রায় শেষ। ছিত্রভানু পশ্চিম বিমান স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ডুবু ডুবু করিতেছেন। তাহার ভুবনব্যাপী কিরণজাল ক্রমান্বয়ই

গুটাইয়া আসিতেছে। দিবা অবসান দেখিয়া পক্ষিকুল স্ব স্ব কুলায় অভিমুখে ছুটিয়াছে। গৃহস্থের বৌ, ঝিয়েরা কাঁকে কুম্ভ করিয়া বিলের ঘাটে যাতায়াত করিতেছে। এই সময় জহুরউদ্দিন বিলের ঘাটে একখানা নৌকায় বসিয়া একদৃষ্টে তাহার ছিপের ফাতাটির প্রতি চাহিয়া আছেন। ইতিমধ্যে 'টুপ্ করিয়া ফাতাটি ডুবিবামাত্রই 'পট্' করিয়া খাঁছ মারিলেন। আর কি অমনই হুইল হইতে ফর ফর করিয়া ডোর ছুটিতে লাগিল; তিনি খেল দিয়া শেষে অনুমান দুই সের ওজনের একটা রুই মাছ নৌকায় তুলিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতে একটি দশম বর্ষিয়া বালিকা বিলের ঘাটে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল। সে মৎস্যটি দেখিবামাত্রই আনন্দে নাচিয়া উঠিল এবং "চাচা মাছ ধরলেন চাচা মাছ ধরলেন" বলিতে বলিতে যাইয়া নৌকায় উঠিল। জহুরউদ্দিন মৎসটি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন "ভাল করে ধরে লয়ে যাও।" বালিকা জহুরউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্রী শামসউদ্দিনের প্রথমা কন্যা নাম শাহেজান খাতুন।

এদিকে মগরবের নামাজের সময় উত্তীর্ণ প্রায় দেখিয়া জহুরুদ্দীন তাড়াতাড়ি ওজু করিয়া সেই নৌকাখানাতেই নামাজ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

জহুরুদ্দীন নামাজপাঠ শেষ করিয়া সেই নৌকা খানাতে বসিয়াই প্রকৃতি সুন্দরীর সৌন্দর্য্য—সুধা পান করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশী রজব-সুধাকর দিবাভাগ হইতেই সর্ব্বগ্রাসিনী তিমির রাক্ষসীকে সতর্ক করিয়াছেন তাই সে বিশ্বগ্রাসিনী ধরা-বক্ষে তমঃজাল বিস্তার করিতে সাহস পায় নাই। শুধাংশুর অমিয়কিরণে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। আকাশের গায়ে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি রজত প্রদীপের ন্যায় টিপ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। বিলের পূর্ব্ব ও দক্ষিণপাড়ের গৃহস্থের বাটীসমূহের বাতির আলো বিলের

স্বচ্ছসলিলে পতিত হইয়া কি মনোহর শোভাই না দেখাইতেছে। সান্ধ্য—মৃদু-সমীর—সোহাগে বিলের বারি-রাশি ঈষৎ-কম্পিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় বিলের বিশাল বক্ষ ভরিয়া দিতেছে। বীচিগুলি চন্দ্রের রৌপ্য কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া মনোরম চাক্‌চিক্‌বেশে নয়নাভিরাম শোভা দেখাইতে দেখাইতে একটির পর একটি তারপর একটী এইরূপ ভাবে ছুটিয়া যাইতেছে এবং সে সকলের মধ্য হইতে কতকগুলি ক্রীড়া-চ্ছলে জহুরুদ্দীনের নৌকা খানায় সোহাগভরে ঈষৎ টক্কর মারিয়া মৃদু মৃদু দোলাইয়া 'টুপ্‌ টাপ্‌' শব্দে হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যাইতেছে। নৌকাখানাও কম রসিক নয়—সেও রসিকতা ছড়াইয়া বীচিগুলিকে তাড়া করিবার ইচ্ছা করিতেছে; কিন্তু তাড়া করিলে বোধ হয় খেলা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে তাই তাড়া না করিয়া স্বস্থানেই কৃত্রিম ক্রোধে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। জহুরুদ্দীন নৌকায় বসিয়া একদৃষ্টে এই সকল ক্রীড়া দেখিতেছেন কিন্তু দৃষ্টির সঙ্গে মনের ঐক্য নাই—তিনি চিন্তায় নিমগ্ন।

জহুরুদ্দীন চিন্তা করিতেছেন,—অহো! কি দেখিয়া আসিলাম! দুখী কি পরমা সুন্দরী বালিকা! তাহার অপর্থিব সৌন্দর্য্যের কি বিপুল গৌরব। এ সংসারে আমি অনেক বালিকা দেখিয়াছি; কিন্তু অমন সুন্দরী ত কোথাও দেখি নাই। যাহারা একবার তাহাকে দেখিয়াছে তাহারা কোন মতেই কবিদের রঙ্গিন কল্পনাকে হাসিয়া উড়াতে পারে না। তাহার কাঁচা কাঁচা মুখ খানি, ডাগর ডাগর নয়ন যুগল, লাবণ্য ভরা দেহখানি দেখিয়া যেমন বোধ হইল তাহাতে তাহাকে এ পাপ তাপ নৈরাশ্যপূর্ণ ধরাধামের মানবী বলিয়া বোধ হইল না। সেটি যেন বেহেস্তের হুর। বোধ হয় মানবীকে বেহেস্ত ভাব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অথবা পথ ভ্রমে; কিম্বা বেহেস্তের জিনিস দুনিয়াতে দেখাইবার জন্য

থানি বস্ত্রাবৃত করিয়া যেমন ধীরপদ সঞ্চালনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল—অহো! তাহার সে গমনই কি সুন্দর! যে সুন্দরী তাহার সকলই সুন্দর! সে গমনের ভাব বলিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। মানবী যে, অমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী হইতে পারে তাহা ত এতদিন জানিতাম না। এতদিন গেল, কিন্তু এখন ত আর রূপের আদর না করিয়া পারি না। দুখী তুমি—। দয়াময়! তুমি কি না করিতে পার! তুমি যে এমন সুন্দর বস্তু গড়িতে জান তাহা ত এতদিন জানিতাম না। প্রভো! তুমি কি—?

মরি মরি দুখী! তুমি আদরের সামগ্রী যাহার ঘর আলো করিবে—তুমি নবনীর পুতুল যাহার ক্রীড়ার দ্রব্য হইবে—তুমি স্বর্গীয় স্বর্ণলতিকা যাহার হৃদয়-বৃক্ষকে জড়ায়ে ধরিবে—তুমি সোণার হরিণী যাহার প্রেম কাননে বিচরণ করিবে—তুমি সখের শতদল যাহার ভালবাসা সরোবরে ভাসমান থাকিবে—তুমি অতুল সোহাগেরপাত্রী যাহার সোহাগ-ভাজন হইবে, সে এ পাপ তাপপূর্ণ সংসারে একজন। সে আকাশের চাঁদ হাতে পাইবে—মর্ত্তে বসিয়া স্বর্গ সুখ উপভোগ করিবে—তাহার হৃদয়-বিমানে নিয়ত শরৎ-পূর্ণিমা বিরাজিত থাকিবে—আশা-উদ্যানে চিরবসন্ত বর্ত্তমান থাকিবে—তার সংসার সোণার সংসারে পরিণত হইবে। হা অদৃষ্ট! হায়রে পোড়াকপাল! আমি এতদিবস ধরিয়া যেমনটিকে মনে মনে খুঁজিতেছিলাম এবং বুকভরা দুঃখ হৃদয়ভরা যন্ত্রণা—জীবনভরা অশান্তি—সংসারভরা কলহ—চক্ষুভরা লজ্জা—কাণভরা গঞ্জনা—মুখভরা নীরবতা লইয়াও যেমনটির জন্য এপর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই, এটী তাহা অপেক্ষাও গুণবতী এবং উপযুক্তা। এটিকে যেখানে বসান যায় সেখানেই মনোরম শোভা পাইবে—কাননে বসাইলে কাননকুসুম—ঘরে বসাইলে ঘরের আলো—জলে বসাইলে শতদল—কণ্ঠে বসাইলে কমনীয় কণ্ঠহার—হৃদয়ে স্থান দিলে হৃদয়রত্ন—বুকে ধারণ করিলে বুকভরা শীতলতা;—মরি মরি! বুক

সুশীতল হয়—অশান্তির অনল নিবিয়া যায়—সুখের ফুল ফুটে—শান্তির বাতাস বয়—প্রাণ বিভোর হয়—। কিন্তু হায়! অমন সুন্দর—অমন মনোহর রত্নটী—না না অমন দুর্ল ভ রত্নটী কি এ অধমের ভাগ্যে জুটিবে? হায়! এমন ব্যথার ব্যথী কে আছে আমার! বালিকে! কে দুঃখী নাম রাখিয়াছিল তোমার? একটা শান্তি-পূর্ণ নাম রাখিতে তাহার আপত্তি কি ছিল? তুমি যে সোণার প্রতিমা—শান্তির নিকেতন। সুখি! তুমি কি তোমার মহিমার উচ্চশিখর হইতে কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া এ নরাধমকে ধন্য করিবে?

বল্গাচ্ছিন্ন অশ্বের গতি এবং প্রণয়-পাগলের চিন্তার গতিকে একই আসন দিলে—বোধ হয় দোষ হইতে পারে না। এই সময় দুখীর কথিত "কেন" বাক্যটী তাহার স্মৃতি পথে উদয় হইয়া শিরায় শিরায় ধমণীতে ধমণীতে বীণারঝঙ্কার তুলিয়া হৃদয়ের পরতে পরতে পিযূষ ঢালিয়া দিল! তিনি সেই "কেন" বাক্যটী বক্ষে করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যেন, আকাশের গায়ে গায়ে সুখ শান্তি নাচিয়া বেড়াইতেছে। তিনি সুধাংশুর প্রতি চাহিয়া বলিলেন "তার কাছে কি ছার তুমি আকাশের চাঁদ! আশা কুহকিনীই বটে।

জহুরুদ্দীন আশাকুহকে আত্মহারা হইয়া সেই কোমল-প্রাণা ফুল্ল-কুসুম স্বরূপিনী বালিকার মুখ-কমলের উপর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক অনেক সুখ দুঃখের চিন্তা করিয়া রাত্রি প্রায় দশটার সময় উঠিয়া বাটী গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জহিরুদ্দীন বাটী যাইবার পাঁচ দিবস পর শনিবার বৈকাল বেলা আবদুল মতিন বিশ্বাস তাঁহার মাতুলালয়ের বহির্ব্বাটির সেই বারাণ্ডা খানায় বসিয়া একখানা বই পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া সালাম জানাইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর ব্যাগ হইতে একখানা খামযুক্ত পত্র বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় সালাম ঠুকিয়া প্রস্থান করিল।

পিওন চলিয়া যাইবার পর আবদুল মতিন বিশ্বাস পত্রখানার শিরোনামা দেখিতেই দেখিতে পাইলেন—খামখানার উপরিভাগের বাম কোণে একটা সুন্দর গোলাপ ফুলের মধ্যে লিখা আছে "তোমারই"। এই লিখা দর্শনে তিনি বুঝিলেন পত্রখানা কোন বন্ধুর প্রেরিত। অতঃপর খামের মোড়ক খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,—পত্রে লেখা ছিল ;—

আমি আপনার বাটি হইতে বহির্গত হইয়া সেই দিবসই অপরাহ্ন বেলা চারিটার সময় মঙ্গলমতে বাটি পৌছিয়াছি এবং খোদার ফজলে সপরিবারে মঙ্গলমতেই আছি। আশাকরি আপনারাও কুশলে আছেন। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি আপনার সেই রাত্রের শেষ বাক্যটি সত্বর কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইতে পারেন তাহা হইলে চির কৃতজ্ঞ থাকিব। তবে যদি হৃ—। আমার সালাম ও দোওয়া শ্রেণীমত বাটীতে সকলকে বলিবেন। ইতি ৪ঠা আষাঢ়।

ভবদীয়—জহির।

আবদুল মতিন পত্রখানা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলেও 'তবে যদি দু' শব্দটীতে কি যেন একপ্রকার সমস্যায় পড়িলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া শূন্য দৃষ্টিতে কি যেন চিন্তা করিয়াও বোধ হয় সে সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া আবার পত্রখানা পাঠ করিলেন। এবারও কিছুক্ষণ চিন্তার পর কি যেন বুঝিয়া দুইএকবার মস্তক বিকম্পিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তৎপর জননীর নিকট যাইয়া বলিলেন ;—

"মা, এই দেখুন জহুরুদ্দীন পত্র লিখিয়াছেন।" অতঃপর পত্রখানা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

পত্র শুনিয়া মা বলিলেন ;—তোকে কোন্ কথার জন্য লিখেছে ?

আ।—ঐযে সেদিন আপনাকে বলিয়াছিলাম আমি তাহার জন্য একটা পাত্রী যোগাড় করিয়া দিতে চাহিয়াছি সেই কথাই লিখিয়াছেন।

মা।—দেখ বাবা পারিস যদি যোগাড় করে দে ; ছেলেটা বড়ই অসুখে আছে। তার অবস্থার কথা শুনা অবধি আমারই সময় সময় মনে কষ্ট হয়। আহা অমন সোণার চাঁদ ছেলেটি !

আ।—অসুখেত আছেনই ; কিন্তু পত্রখানায় আমার মনে একটু কথা হয়েছে।

মা।—সে কি কথা ?

আ।—'তবে যদি দু—"কথাটী কি ?

মা।—হাঁ সেখানে যেন কি কথা বলিতে গিয়ে থেমে গিয়েছে।

আ।—আমার মনে একটা কথা হইয়াছে সেটাই না কি ?

মা।—সেটা কি কথা ?

আ।—আমার মনে হয় তিনি বোধ হয় আমাদের দুখীর বিষয় কোন কথা বলিতে গিয়ে লজ্জা বশতঃ থামিয়া গিয়াছেন।

মা।—কি জানি বাবা হ'লে হ'তেও পারে। তার হাতে দুখীকে

তুলে দিতে পারলে ত ভালই হত ঘরের ছেলে একরকম ঘরেই থাকত। আর তাহারা বেশ বুনিয়াদি ঘর।

আ।—আচ্ছা আমি তার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি—আমার অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে দুখীর নিকা তার সঙ্গেই দিব। তার ন্যায় সৎপাত্র এ অঞ্চলে পাওয়া কঠিন।

মা।—দেখ বাবা তোর মামুর সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভাল বুঝিস তাই কর;—দুখীকে ত আর ঘরে রাখতে পারব না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। এদিকে আবদুল মতিন কাগজ, কলম লইয়া পত্রের উত্তর লিখিতে বসিলেন।

দশই আষাঢ় আবদুল মতিন বিশ্বাসের লিখিত পত্র জহুরুদ্দীনের হস্তগত হইল। পত্রে লেখাছিল;—"আপনার চৌঠা আষাঢ়ের লিখিত পত্র অদ্য পাইয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। আশাকরি মধ্যে মধ্যে এইরূপ পত্র লিখিতে থাকিবেন। আমার পূর্ব্বোক্তি অবিলম্বে পূরণ করিতে পারিব সে আশা আমার আছে। তবে আপনার লিখিত;—"তবে যদি দ—" শব্দটীতে কিছু গোলযোগে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সে গোলযোগের আনুমানিক সমাধানও করিয়াছি। যদি আমার অনুমান ঠিক হইয়া থাকে তাহা হইলে বোধ হয় উক্তি পূরণার্থে আমাকে আর অন্যত্র কষ্ট পাইতে হইবে না। আমার অনুমান সত্য হইয়া থাকিলে অবিলম্বে অত্র পত্রের উত্তর দিবেন। অন্যথায় অন্যত্র চেষ্টা পাইব। ইদানিং আমাদের মঙ্গল জানিবেন। ইতি ৭ই আষাঢ়।

বিনীত—

আবদুল মতিন।"

আবদুল মতিন বিশ্বাসের এই পত্র পাইয়া জহুরুদ্দীন যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া তখনই সেই পত্রের উত্তর

লিখিতে বসিলেন এবং লেখা শেষ করতঃ তাহা ডাকে না দিয়া জনৈক সুচতুর লোকের মারফতে লক্ষ্মীপুর পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবদুল মতিন বিশ্বাস রাজপথে উঠিয়া পাদচারী করিতেছেন, এমন সময় জনৈক পথিক তাঁহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইখানাই কি লক্ষ্মীপুর?" তিনি গ্রীবা বক্র করিয়া উত্তর প্রদান করিলেন।

প।—আবদুল মতিন বিশ্বাসের বাটী কোনখানা বলিতে পারেন?

আ।—কেন, তার বাটীর প্রয়োজন কি?

প।—জি, তাঁহার নামের একখানা পত্র আছে।

আ।—দেখি কেমন পত্র।

পথিক পত্র দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন;—"পত্র দিতে বোধ হয় আপনার সাহস হইতেছে না। তা ভয়ের কোন কারণ নাই পত্রখানা তাহারই হাতে পড়িবে।" এই বলিয়া একটু মুচকি হাসিলেন।

পথিক ঈষৎ লজ্জিত হইয়া জামার পকেট হইতে একখানা খামযুক্ত পত্র বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। তিনি সেখানেই দাঁড়াইয়া পত্রখানা—পাঠ করিলেন—পত্রের শেষাংশে লেখা ছিল; "আপনার অনুমান সত্য—এখন অনুগ্রহ। প্রেরক জহুরুদ্দীন।

তিনি পত্রখানা পাঠ শেষ করিয়া পত্রবাহককে সঙ্গে করত: বাটী চলিয়া গেলেন। তৎপর মগরবের নামাজ পাঠান্তে পত্রবাহককে প্রশ্ন করিয়া জহুরুদ্দীনের বিষয় অনেক কথা অবগত হইলেন।

অতঃপর নৈশ-ভোজন সমাপনান্তর আবদুল মতিন বিশ্বাস তাঁহার মাতা, মাতামহী, মাতুল ও দুইচারিজন আত্মীয়কে একত্রিত করিয়া নিকাহের কথা উত্থাপন করিলেন। তাঁহার মাতামহী সতিনের উপর

দৌহিত্রীর নিকাহ দিবেন না বলিয়া ঝাড়িয়া যওয়াব দিলেন। শেষ কথা তাঁহাদের মধ্যে স্বপক্ষ বিপক্ষভাবে অনেক কথা হইয়া নিকাহ হইবে বলিয়াই স্থিরকৃত হইল।

পর দিবস আবদুল মতিন বিশ্বাস জহুরুদ্দীনের প্রেরিত পত্রবাহককে বলিলেন, "আপনি সংবাদ দিবেন খোদার কাজ খোদা করাইলে নিকাহ হইবে; একটা পাকাপাকি কথা করিবার নিমিত্ত জহুর উদ্দিন বিশ্বাসকে লোক পাঠাইতে বলিবেন।" পত্রবাহক, "জি-আচ্ছা" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

জহুর উদ্দিন আহমদ যথাসময়ে আবদুল মতিন বিশ্বাসের প্রেরিত সংবাদ পাইয়া আনন্দ-পারাবারে ভাসিলেন এবং মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন, —এইবার যেপ্রকারেই হউক নিকাহ করিব। ভাই সাহেবগণ এবারও যদি বাধা প্রদান করেন তাহা হইলে পায়ে ধরিয়া সাধিতে হইলেও সাধিব। তিনি এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়া সেই দিবসই প্রকাশ্যভাবে নিকাহের কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন এবং ২২শে আষাঢ় লোক যাইবে এইমর্ম্মে আবদুল মতিন বিশ্বাসকে একখানা পত্র লিখিলেন।

পত্রের সংবাদে আবদুল মতিন বিশ্বাসের বাটীতে নিকাহের ধুম পড়িয়া গেল। দুখী খোদা-তায়ালাকে ডাকিয়া, বলিল—হে রহমানের রহিম! তোমারই কৃপা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যু।—রাঙ্গা টুক্ টুকে পুথি খুলে কি দেখতেছ ভাই!

বা।—কবির রঙ্গিন কল্পনা।

যু।—আজি ভাই একটা খোস খবর লয়ে এসেছি মোটা বকসিস চাই।

বা।—কান মলে দিতে হবে কি ?

যু।—তা তুমি যাহাই বল, কিন্তু মোটা বখসিস চাই।

বা।—আচ্ছা বল তোমার খোস খবরই শুনা যাক্।

যু।—কাঁটাল পেকেছে।

বা।—বুঝিলাম না।

যু।—কাঁটাল পেকেছে।

বা।—(ঈষদ্ধাস্তে) আরে ভাই কাঁটালে যে কাঁটা থাকে।

যু।—থাকে কিন্তু—।

বা।—(যুবতীর কথায় বাধা দিয়া) না ভাই আমি তোমার কিন্তু-পরন্তু শুনিব না। দেখ তুমি যদি এইরূপ রগড় কর তাহা হইলে তোমাকে আর কোন কথা বলিব না।

যু।—ক্ষমা। তোমাকে ভাই আর কিছু বলব না। এখন—

বা।—এখন আবার কি ?

যু।—এখন কিছু চাই।

বা।—কি চাও ?

যু।—চাই—যাহাতে ইহকালে ও পরকালে সুখভাগিনী হইতে পারি তাহাই আজি চাই।

বা।—সে সুখ ত কেহ কাহাকে দিতে পারে না।

যু।—দিতে পারে না সত্য, কিন্তু তার উপায় ত বলে দিতে পারে।

বা।—তা নিশ্চয়।

যু।—তাহাই বাঁদীর আরোজ।

বা।—তুমি সলেহা হও।

যু।—বুঝিলাম না।

বা।—বুঝিলে না—তুমি পুণ্যবতী আর সতী হও।

যু।—তাহা ত আছিই তুমি আবার কি রকম হইতে বল ?

বা।—দেখ ভাই এটা তোমার গর্ব্ব করা হইল—গর্ব্ব করা পাপ।

যু।—কিসে গর্ব্ব করা হইল।

বা।—এযে নিজের গুণ নিজেই গান করা হইল।

যু।—না ভাই আমিত সেরূপ ভাবিয়া বলি নাই, এক দিন শুনিয়াছিলাম তাই বলিলাম।

বা।—কি শুনিয়াছিলে ?

যু।—আমিত বরাবরই মার বাড়ী থাকিতাম তাহা ত তুমি জান। এই ত মাত্র বৎসর দু'এক এখানে আছি। আমাদের ওখানে প্রায় মাঝে মাঝে বড় বড় ঘরের হিন্দু মেয়েরা বেড়াইতে আইসেন এবং সময় সময় মাজানের সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নানা প্রকার আলোচনা করিয়া থাকেন। তাহতেই একদিন শরৎ ঠাকুরের মার মুখে শুনিয়াছিলাম "স্বামীসেবা ব্রত পালন করাই রমণীদিগের ধর্ম্ম এবং তাহাতেই তাহাদের মুক্তি আছে।" আমি ত স্বামীসেবায় কোন দিন ত্রুটী করিনা।

বা।—(ঈষদ্ধাস্যে) পাগলি।

যু।—ইহাতে আমার পাগলীপণা কি দেখিলে ?

বা।—শরৎ ঠাকুরের জননীর কথা বিশ্বাস করিতে দেখিলাম।

যু।—কেন, তবে কি সেটা ঠিক কথা নয় ?

বা।—কখনই না! তুমি সেরূপ শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, আমিও তদ্রূপই শুনিয়াছি; হিন্দু ধর্ম্মমতে পতিব্রতটা পালন করিতে পারিলেই রমণীদের কর্ত্তব্যের ইতি হইল এবং তাহাই তাহাদের ধর্ম্ম। হিন্দুদের প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী ইত্যাদিরাও এই ধর্ম্ম পালন করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আমার বোধ হয় হিন্দু ধর্ম্মে রমণী জাতির কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই। তাহা থাকিলে কেবল পতিব্রত পালনে কখনই কর্ত্তব্যের শেষ হইত না। তা হিন্দু ধর্ম্মে যাহাই থাক, কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্ম্মে সেরূপ বিধান নাই।

যু।—সেরূপ নাই তবে কিরূপ আছে ?

বা।—আমাদের ইসলাম ধর্ম্মে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান অস্তিত্ব সমান অধিকার বিধায় কর্ত্তব্যও সমান। মূল ধর্ম্মে কিছুই কমি-বেশী নাই তবে শাখা বিভাগে আছে। স্বামী স্ত্রীর বিষয়টা ধর্ম্মের একটা শাখা মাত্র।

যু।—তৌবা! তাহা হইলে ত আমি ভুল বুঝিয়া ছিলাম।

বা।—এখন তোমার পাগলামী ধরিতে পারিলে? দেখ তুমি রীতি মত পতিব্রত পালন করিতেছ এবং নামাজ রোজা ইত্যাদি ধর্ম্ম কার্য্যও করিতেছ; ইহা না করিলে তোমার মুক্তি নাই, কেবল যদি পতিব্রত পালনেই মুক্তি থাকিত তাহা হইলে নামাজ, রোজা ইত্যাদি করার প্রয়োজন কি ?

যু।—ভাই পোড়া কপাল! অভাগীর যদি আক্কিল থাকিত তবে কেন।

বা।—ভাই এখন দুঃখ করিয়াত কোন ফল নাই সব কপালের কথা।

তবে এখন আর তুমি একবারে বালিকাটি নও, চেষ্টা করিলে ক্রমে সবই শিখিতে পারিবে।

যু।—বুবুজান! আশা করি তুমি রোজই এইরূপ একটু করিয়া আমাকে ধর্ম্মের কথা শুনাইবে, হাজার কাম থাকিলেও ফেলিয়া আসিয়া শুনিব।

বা।—খোদা মালিক চেষ্টা পাইব।

যু।—হিন্দু ধর্ম্মের এই একটা কথা বিশ্বাস করিয়া মহাভ্রমে পড়িয়াছিলাম। তাহাদের ধর্ম্মের এইরূপ আর কোন কথা আমাদের মধ্যে আছে কি?

বা।—অনেক আছে সে সকল তোমাকে আর এক দিন বলিব। এখন যাও বেলা হইয়াছে মৌলবী সাহেবের জন্য নাস্তা পাঠাইয়া দাও গে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভাল, মন্দ কথা দু'টী বাতাসের আগে উড়িয়া থাকে। জহুরউদ্দিনের নিকাহের কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসী সকলেই ভোজের আশায় জিহ্বা চোখাইতেছেন। সে কথা জহুরউদ্দিনের অগ্রজদের কানেও যে উঠে নাই তাহাও নহে; কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহারা যেরূপ একগুঁয়ে হইয়া বাধা দিতেন এখন তাঁহাদের আর সে ভাব নাই; পৃথক হইবার পর তাঁহাদের মতের অনেকটা অনৈক্য ঘটিয়াছে।

জহুরউদ্দিনের নিকাহের কথা প্রকাশ হইবার কএক দিবস পর তাঁহার অগ্রজগণ একদিন একত্রিত হইয়া তাঁহার নিকাহ বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন; "ছোঁড়া আবার মাথা পাগলা হল কবে থেকে,—না অমন করে তার নিকা-টিকা দিতে হবে না। সে পৃথক হয়ে থাকলে কি হবে;—শেষে কোন একটা ভাল মন্দ হলে মুখ হাসবে কার?"

তাহার এই বাক্যের পোষকতা করিয়া দ্বিতীয় ভ্রাতা বলিলেন;—"তাই না ত কি আর নিকা টিকা ওসব কিছু দিতে হবে না। ছোঁড়ার ফুটনি। ঘরে একটা বৌ থুয়ে আবার নিকা। হাঁহে ছোঁড়া যে বার বার নিকা নিকা করে পাড়া মাথায় করছে তাতে কি তার একটুও লজ্জাবোধ হয় না? আর সেটাই বা কি জিনিস একটা ছেলে হবার কল বৈ ত না। তা কাল, ধল কোনপ্রকার একটা হলেই হল, তা না করে ওহঃ বাবা! এটা ত কাল, নামাজ পড়ে না, হাসিখুসি করতে জানে না, এ সকল কি বে-বুনিয়াদির

তাহার এই কথায় সেখানকার সকলে না হাসিয়া পারিলেন না। তৎপর তৃতীয় ভ্রাতা বলিলেন; "হাসি ঠাট্টার কথা নয়, বিবেচনায় যাহা ভাল হয় তাহাই করা উচিৎ। আমার মতে তার নিকাটা এখন দেওয়াই ভাল। সে ছোট ভাই বিশেষতঃ অনেক দিবস হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে—আমরা ছাড়া কে তাহাকে দেখিতে আছে? পরন্তু সে যখন এক রকম কথা ঠিক করে ফেলেছে তখন নিকাটা না দেওয়াই দোষের কথা।

এই ভাবে তাহাদের মধ্যে স্বপক্ষ বিপক্ষ ভাবে অনেক কথা অনেক বাকোবাক্য হইল; কিন্তু মীমাংসা কিছুই হইল না। কথা শেষে শামসউদ্দিনের পত্নীর কানে উঠিল।

অদ্য শামসউদ্দিনের পত্নী বড়ই নারাজ—বড়ই দুঃখিতঃ। দেবরের নিকার কথা শ্রবণ মাত্রই সে মুখখানা অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধকার ও ভারী করিয়া বসিয়াছে। আজি সে সমস্ত দিবস ধরিয়া সংসারের কোন কাযে হাত দেয় নাই এবং পানীয় জল পর্য্যন্তও স্পর্শ করে নাই। সে সেই রাত্রিতে তদ্রূপ মুখ ভারী করিয়াই ঘরে গেল।

শামসউদ্দিন জানেন তাঁহার পত্নী স্বভাবতঃই রুষিত মেজাজা। সে প্রায়ই যা তা কথার খুটিনাটি ধরিয়া মধ্যে মধ্যে মুখ ভারী এবং ঝগড়া ইত্যাদি করিয়া বাটীতে অসন্তোষ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাই তিনি অন্য সমস্ত দিন পত্নীর মুখখানা ভারযুক্ত দেখিয়াও কারণ জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

রাত্রিতে শামসউদ্দিন স্বীয় শয়নগৃহে যাইয়া দেখিলেন তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী মলিন মুখে বসিয়া শিশুপুত্র মুসাকে দুগ্ধপান করাইতেছেন। প্রিয়তমার মলিন মুখ দেখিলে কাহার না মনে কষ্ট হয়? শামসউদ্দিনের প্রাণে বড়ই বাজিল,—তিনি শয়ন-খট্টায় উঠিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তুমি অমন হয়ে আছ কেন?" স্ত্রী নীরব।

শা।—কথা বলনা কেন—তোমার কি হইয়াছে ?

এবার অভিমানিনী যেন বুকভরা দুঃখ লইয়া বলিল,—"আমার কি হবে ?"

শা।—কিছু না হয়েছে তবে অমন হয়ে আছ কেন ? শুনিলাম সমস্ত দিন কোন কাম কাজ কর নাই এবং পানি পর্য্যন্ত খাও নাই,—এসব তোমার কি ?

স্ত্রী—সে কথা তোমার কাণে কে দিল ?

শা।—কেন,—বাটীতেই শুনিলাম্।

স্ত্রী।—তা শুনিতে পার, ক্ষিধে পেলেই ত খাব।

শা।—ওসকল যেতে দাও, কথা কি তাই বল।

স্ত্রী।—তুমি এমন পাড়াপাড়ি করতে লাগলে কেন ? ঘুমাতে এলে চুপ করে ঘুমাও।

শামসুদ্দিনের স্ত্রীর রূপগুণ কেমনই হউক, কিন্তু তিনি তার প্রেম-পাগল। স্ত্রীর নীরস বাক্যে তাহার মনে একটু বিরক্তির সঞ্চার হইল কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া সেইরূপ সরল ভাবেই বলিলেন ;—ওসব কি,—কি হয়েছে খুলে বল।

স্ত্রী।—আমি আর এক অন্নে থাকব না।

শা।—কেন তোমার আবার হঠাৎ কি হইল ?

স্ত্রী।—হবে আবার কি—ইচ্ছা। এতদিন থাকলাম আর থাকব না। আমরাত আর কিছু লিখে পড়ে দেই নাই যে চিরকাল সঙ্গে থাকব।

শা।—তা পৃথক হবে হইও, কিন্তু কারণটা কি ?

স্ত্রী।—কারণ আবার কি—বলেছি ত ইচ্ছা।

শামসুদ্দিন বিরক্তভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন ;—"ওঁহ্—এসকল কি ?"

স্ত্রী।—তুমি কি কিছু শুন নাই ?

শা।—কই তেমন কিছু শুনেছি বলে ত মনে হয় না।

স্ত্রী।—তা শুনবে কেন, দু'বেলা খাও আর নাকে তেল দিয়া ঘুমাও। তুমি ত কেবল মাঠে খেটে ভাত খেতে শিখেছ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোদ-বাতাসে খেটেখুটে এনে সকলকে খেতে দাও আর গুষ্টিশুদ্ধ বসে বসে খাক আর দু'হাতে উড়াক ;—সংসারের কোন্ খানে কি হয় সে খবর তুমি রাখবে কেন ?

শা।—তোমার ঘোর ফার্শী বোঝা গেল না।

স্ত্রী।—(সবেগে মুখ নাড়াদিয়া) শুন নাই বাটীতে আর একটা ঘর-আলো-করা ভাই-বৌ আসছে।

শা।—হাঁ সে কথা ত শুনেছি—জহুর নাকি নিকা করতে চাহিতেছে।

স্ত্রী।—চাহিতেছে-নয়—করবে।

শা।—তা করুক তাতে ক্ষতি কি ?

এবার শামসুদ্দিন স্বচক্ষে পত্নীর করালীবৎ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার স্ত্রী গিরি-প্রতিহত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ঘৃণায় মুখ নাড়া দিতে দিতে বলিল,—তা ক্ষতি হবে কেন ? তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা দোষটা গেল না। এমনই ত সারাগুষ্টি বসে বসে খলে পূর্ণ করতেছে—কেহ দু'হাত দিয়া কোন কাজ ছুঁবে না, রোদে যেতে হলেই ফুলের শরীর উঁনুয়ে যাবে। তাতে আবার সদ্য কলাগাছের মত একটা মানুষ না ভূত এনে ঘর আলো করে রেখেছে তাকে লয়ে ত জ্বলতে জ্বলতে জনম গেল। তাকে কোন ভাল কথা বলতে গেলেই বাড়ীময় তোল-পাড় হয়ে উঠে। আবার তার দ্বারা সময় সময় পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়ে নিতে হয়। তার পর আর একটা সুন্দরী এনে বাড়ীতে

একটা মাগীর দল করতে হবে নাকি? তোমার আদুরে ভায়ের নিকা দিতে হয় দাওগে আমি তা দিব না।

পত্নীর ক্রোধের প্রতি শামসউদ্দিনের ততদূর ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি সেইরূপ সরল ভাবেই বলিলেন ;—না না বাধা দিতে হইবে না। ছোঁড়াটারত এমনই অসুখে জীবন যাইতেছে, তাহাতে না হয় এখন আমাদের সঙ্গে আছে, কিন্তু চিরকাল ত আর থাকিবে না ; সংসারের যেরূপ ভাব গতি তাহাতে অবশ্যই ঘর ভাঙ্গিবে। তুমিওত বুঝিতে পারিতেছ সে অবস্থায় ও বৌ-দ্বারা কোন মতেই তাহার সংসার চলিবে না। সে কষ্টে থাকিলে কি আমাদের কষ্ট নয়? সে সকল কথা যাক্ যখন সে নিকার কথা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে তখন নিকাটা দিয়ে দিতে হবে। বিশেষতঃ সে নিকা করিবার নিমিত্ত অনেক দিবস হইতে চেষ্টা পাইয়া আসিতেছে। আর নিকা করার পর যে কয় দিন সঙ্গে থাকিবে সে কয় দিন তোমারও কাজের অনেকটা সুবিধা হবে।

স্বামীর বাক্যে স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়া গেল, সে ক্রোধে একটা মানুষ যেন দশটা হইয়া আবার সেই মুখনাড়া দিয়া বলিল ;—আধ বুড়ঃ মিনসে হলে তবুও হিতাহিত জ্ঞান হল না। তার নিকা দিয়ে তোমার লাভটা কি? মাথার চুল পাকল আক্কেল হবে কখন? আর আমি এখন কোন কামে পারিনা তাই আমার সুবিধা হবে?

এবার শামসউদ্দিনেরও মেজাজ গরম হইয়া উঠিল ; কিন্তু তাহাতে কি হয়—তিনি যে প্রেম-পাগল পত্নীর নিকট জোর করিয়া কোন কথা বলিতে তার যে সাহসের অভাব। শরতের জীমূতের ন্যায় এই ভুয়া মেজাজ গরমিতে তাহার মুখে কোন প্রকার ক্রোধসূচক ভাব দেখা গেল না বরং মুখখানা মলিন হইয়া উঠিল। তিনি সেই মুখ-ভরা মলিনতা লইয়া বলিলেন ;—লাভালাভ আর কি—সে ছোট ভাই—তাহাকে দেখিতে

আছে। আর তুমি যদি সব কায করিতে পার তাহা হইলে আবার উপরন্তু দুই তিন জন করিয়া লোক রাখিতে হয় কেন ?

স্ত্রী।—মেয়ে মানুষের বুদ্ধিটুকু বুঝবার ক্ষমতাও কি মাঠ-খাটাদের নাই—ঐ ত তোমার বুঝবার ভুল। আমি সব কায করিনা আর কোন কারণ আছে না এমনই পারিনা করিনা। দুই অংশের কার আমি একেলা টানিব কেন ? তোমার আদুরে ভাই কি আমার পায়ে হাতে পাঁচখানা গহণা দিবে ? তুমি এখনই পৃথক হইয়া দেখ আমি কেমন কায করিতে পারি। আর ভাইয়ের নিকা নিকা করে ত পাড়া মাথায় করেছ, কিন্তু ভেবে দেখেছ এ নিকাতে কত খরচ হবে।

শা।—তা খরচ দু'দশ টাকা কম বেশী হইবেই।

স্ত্রী।—তুমি যেমন মানুষ তেমনই তোমার বুদ্ধি। দু'দশ টাকা দেখেছ সেটাই তোমার মনে আছে। দু'দশ টাকার কথা নয় আমি জানি আবদুল মতিনেরা বড় লোক, তাদের বাড়ীতে সকলেরই গা-ভরা সোণার গহণা। সে বাড়ীতে নিকা করা মুখের কথা নয় ;—এ নিকাতে গৃহস্থালী শুদ্ধ টান ধরবে। তোমার কিছু হুঁস আছে ? তোমার একটী নয় দুই দুইটী ছেলের বিয়ে দিতে আছে ;—এই ত একটী মেয়ের বিয়ে দিতেই অত টাকা খরচ হয়ে গেল। ইহাতেই বুঝ আর দু'খানা বিয়ে দিতে কত টাকা দরকার হবে। আমি ইহাও বলিয়া রাখিতেছি—আমি আমার মুসার বিয়ে মনমত দিব। আর তুমি কি মনে বুঝেছ নিকা করে তোমার আদুরে ভাই সঙ্গে থাকবে, তখনইত পৃথক হতে ছিল। তবে কেবল ঘর চলবেনা বলে কৌশল করে সঙ্গে আছে—নিকা হলেই ঘর ভাঙ্গবে। তখন তোমার এ টাকাও যাবে এবং সে দু'খান বিয়ের খরচ তোমাকে যোগাইতে হইবে। বুঝে দেখতে গেলে এতেই কেহ বাদসা কেহ ফকির হবে ; কিন্তু তোমার মত

স্বামীকে নীরব দেখিয়া সে আবার বলিতে লাগিল ;—তুমি আমার কথা গুলি ভাল করে বুঝে দেখ—তুমি যে এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলের আহার যোগাও বাজে খরচ চালাও এসব যে তোমার অকারণ যায় তাহা কি কোন দিন ভাবিয়া দেখ ? এত করিয়াও কি কোন দিন কারু মুখে তোমার একটু যশের কথা শুনিতে পাও ? আর ঐ যে সময় সময় তোমার রক্ত-পানি-করা জিনিসগুলি বিক্রয় হয় তার কি একটা কানা কড়িও কোন দিন হাতে পাও ? তুমি ত যেন বাড়ীর কেহই নও—তাহারই সব। বাড়ীতে কত টাকা হয়, কত খরচ হয়, কত বাক্সে উঠে, কত এদিক ওদিক যায় তাহা কেহ বুঝে খুঁজেনা ; তোমার যদি কোন দিন একটা পয়সার দরকার হয় তাহা পাইবার যো নাই। তবে যদিও কোন দিন কিছু পাওয়া যায় , কিন্তু তার মত মুখনাড়া, দাঁত-ঝাড়া না খাইয়া পাওয়া যায় না। হায় আল্লা ! লোকের মুখনাড়া, দাঁত-ঝাড়া খেতে খেতেই জনম গেল। আজি যদি তুমি পৃথক হয়ে থাকতে তাহলে আমার গায়ে গহণা ধরত না—আমার ভাত কে খায়। এই বলিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিল।

এইবার স্ত্রীর বাক্য শামসউদ্দিনের মনে ধরিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অকাট্য স্নেহবন্ধন ভেদ করিয়া পত্নীর কথাগুলি তাহার চক্ষের সম্মুখে কত কি করিয়া তুলিল। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন ; "আচ্ছা দেখা যাবে।"

স্ত্রী বলিল ;—দেখা যাবে নয়, আমি আর অত বাবুগিরি দেখতে পারব না। তোমার খাটুনি দেখে আমার বুক ফেটে যায়। আর সে কেবল ছাতা মাথায় দিয়ে বাবুগিরি করে বেড়াবে। কার রাজা, কার মহাজন, কার সালীস বিচার রাত দিন যে এসকল করিয়া বেড়ায় তাহাতে কি তোমারে কিছু টাকা আনিয়া দেয় ? আর অকারণ টাকা ব্যয়,—সেদিন ত স্বচক্ষেই দেখলে ঐ যে ভিক্ষারিণী মাগীটা এসে 'হাউ হাউ' করে কাঁদতে লাগল,

কহা না বলা সোজা হাতে তাহাকে চারি আনা পয়সা বাহির করে দিল,—কেন তাকে একটা পয়সা বা এক মুঠা চাউল দিলে কি খুসি হত না ? না সে ঝগড়া করত ? অত ফাজিল খরচের দরকার কি ? সে পয়সাতে কি তোমার অংশ ছিল না ? আর শুনেছি বড় সাধের মাদ্রাসা খুলেছে, তাতেও নাকি গৃহস্থালী টান ধরতে লেগেছে। সে মাদ্রাসায় আমাদের ক'টা ছেলে পড়ে ? পরের ছেলে পড়াবার জন্য নিজ অর্থের এত অপব্যয় কেন ? আর মনে রাখিও আমি শুনেছি আবদুল মতিন বলেছে "এখানে নিকা করতে হলে অনেক উপরে উঠতে হবে" এটা মাত্র ইসারা। এখন বলছি—এত দিন যা হবার তা হয়ে গেল, তুমি যদি মানুষ হও তা হলে এখন হতে মানুষের মত পাঁচখান বুঝে সুঝে চল। শেষে আমার মুসাকে যাতে পথে বসতে না হয়। তুমি যদি আমার কথা শুন তাহলে কালকেই পৃথক হও। দেখ আরো বলছি তুমি যদি আমার কথা মত কায না কর তা হলে কালকেই আমি বাড়ীর বাহির হব না হয় বাড়ীতে কোন একটা অনর্থ ঘটাব। তুমি আর আমার মুখ দেখতে পাবে সে আশা করিও না—আমি কার মেয়ে ? সে এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মুখ-নাড়া দিতে দিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া রন্ধন আঙ্গিনার দিকে চলিয়া গেল। এদিকে শামসউদ্দিন বেচারা অপরাধী মানুষের ন্যায় শয়ন-শয্যায় পড়িয়া 'ফোঁস ফোঁস' করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। ধন্য রমণী ! ধন্য তোমার ভেল্কি !! ধন্য তুমি অবলা নামের গৌরব !!!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শামসউদ্দিন প্রত্যহ ফজরের নামাজ পাঠান্তে বৈঠক ঘরে বসিয়া বাটীর চাকরদিগকে কাযের ফরমায়েস করিয়া থাকেন ; কিন্তু অদ্য তিনি তাহা না করিয়া মলিন মুখে বসিয়া রহিলেন। বেলা অধিক হইতেছে তবুও মনিব সাহেব কাজের ফরমায়েস করিতেছেন না দেখিয়া বাটীর প্রধান চাকর 'তেনু' মনিবের নিকট যাইয়া কাজের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইল "তোদের মনে যা হয় কর গে।" তেনু বুঝিল মনিবের মন খারাপ।

অতঃপর একটু বেলা হইলে শামসুদ্দিন জননীর নিকট যাইয়া বলিলেন ;—মা, আজি জহুর কোথায় গিয়াছে? কথার ভাবে জননী বুঝিলেন—বাক্য নীরস।

মা।—কি জানি বাবা, আজ সকাল থেকেই তাকে দেখতে পাই না।

শা।—তা যথা ইচ্ছা যাক আমি আপনাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।

মা।—কি কথা বাবা?

শা।—সে নাকি নিকা করিতেছে?

মা।—কি জানি সেই কথাই ত শুনিতেছি।

শা।—সে ঘরে একটা বৌ থুয়ে আবার নিকা করে কেন?

মা।—সে কথা কেমন করে বলব।

শা।—কেন সে কি আপনাকে কিছু বলে নাই?

মা।—কই এর্য্যন্ত ত কিছু বলে নাই।

শা।—তবে কি সে নিজে নিজেই নিকা করিতেছে?

মা।—তাকি হয় নিকা করিলে অবশ্যই বলবে।

শা।—তা বলা না বলা তার ইচ্ছাধীন; কিন্তু এ নিকাতে আমি এক পয়সাও খরচ দিতে পারিব না।

মা।—বাবা শামসু! অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়, সে যদি নিকা করে তা হলে কি আমাদিগকে না বলেই করবে। আর যদি সে একান্তই নিকা করে তা হলে দু'ভায়ে মিলে মিসে খরচ না দিলে সে একেলা কোথায় পাবে? বাবা, তুই যেমন কথা বলতেছিস তা শুনলে লোকেই বা কি বলবে। ছি, অমন কথা বলিতে নাই।

শা।—লোকে না হয় বলিবে আমি মানুষ ভাল নহি; কিন্তু আপনার ছেলে যে ঘরে একটা মস্তবড় বৌ রেখে আবার নিকা করিতে যায় তাহাতে লোকে কিছু বলিবে না? আর গৃহস্থের ঘরের ছেলে হয়ে গণ্ডা খানেক বৌ করিবারই বা মানে কি?

মা।—মানে যা তা তোমাকে আর বলে দিতে হবে না, ও পোড়ামুখির মেয়েটা কোনদিনই তার পছন্দ হল না। এপর্য্যন্ত তার হাতের পানি টুকুও ত ছোঁয় না। পোড়ামুখিকে কত শিখালেম, কত বুঝালেম; কিন্তু সেটা কথা ধরবার মানুষই নয়।

শা।—তা পছন্দ না হয় একটা কেন পাঁচটা করুক তাহাতে আমি বাধা দিতে যাইব না; কিন্তু বলেছি এক পয়সাও খরচ দিতে পারব না এবং ইহাও বলিতেছি—আজকেই পৃথক হব।

পুত্রের হৃদয়হীন কর্কশবাক্যে লঘুহৃদয়া জননীর দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইল। তিনি চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিলেন;—শামসু! অমন কথা কেন বলিস বাবা! এমনই ত বাড়ীভরা আনন্দের

হাটে নিরানন্দের বাজার বসেছে—তাতে যা তোরা দু'জন আমার চক্ষের সামনে আছিস, অমন কথা বলিস না বাবা। তোরা সকলে মিলে বুঝে সুঝে দেখ তার নিকা দিতে হয় দে না হয় না দে; কিন্তু পৃথক কথাটা আর মুখে আনিসনে বাবা। আমি যে ক'টা দিন বেঁচে আছি তোরা দু'ভাই মিলে মিসে চক্ষের সামনে থাক। বাবা, বুড়া মাকে আর কাঁদাসনে। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

বিগত রাত্রি হইতে শামসুদ্দিনের সরল হৃদয় পাষাণ হইয়াছে। জননীর নয়ন-নীরে সে পাষাণ গলিল না। তিনি সেইরূপ নীরস কথাতেই বলিলেন;—"আপনি যাহাই বলুন আমার ঐ এক কথা,—আর একসন্ধ্যাও সঙ্গে চুলা জ্বালাইব না। এর জন্য যা হয় তাহাই হইবে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সবেগে বহির্ব্বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন।

এদিকে বৃদ্ধাজননী চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিলেন। শামসুদ্দিনের স্ত্রী একটু অন্তরাল হইতে তাহাদের মাতা, পুত্রের কথা শুনিতেছিল। এই সময় হাত ও মুখনাড়া দিয়া বলিল;—বেশ হয়েছে—এইরকমই চাই।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জহুরুদ্দীন আহমদ কোন বিশেষ কার্য্য বশতঃ সেদিবস ফজরের নামাজ পড়িয়াই গোলাগ্রামের কাছারী গিয়াছিলেন। তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বেলা দ্বিপ্রহরের সময় বাটী পৌছিলেন। তিনি অন্যান্য দিবস এহেন সময় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া বাটী আসিলে আর কেহ না হইলেও তাঁহার স্নেহশীলা জননী সম্মুখস্থ হইয়া ভাল মন্দসংবাদটা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন; কিন্তু অদ্য তাঁহার বাটী আসা প্রায় ১০।১৫ মিনিট সময় হইতেছে। তবুও জননী কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। জহুর উদ্দিন আসিয়া পূর্ব্বদ্বারি যে ঘরখানার বারাণ্ডায় বসিয়াছিলেন তাহার পার্শ্বে-ই দক্ষিণদ্বারি ঘরের অলিন্দে তাঁহার জননী বসিয়াছিলেন। পুত্র যে সময় বাটী আসেন সে সময় তিনি একবার আড়চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন। ক্লান্তপুত্রের ঘর্ম্মাক্ত মুখখানা দর্শনে জননীর হৃদয়ে যারপর নাই ব্যথা লাগিলেও এ পর্য্যন্ত পুত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার মুখ সরে নাই।

জহুরুদ্দীন ক্ষুধা এবং পিপাসায় প্রাণ ফাটিয়া গেলেও জননীর স্বভাবের ভাবান্তর দেখিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না, কিন্তু প্রায় ২০ মিনিটকাল ধরিয়াও যখন জননী কোন কথা বলিলেন না—তখন অগত্যা তিনি অতীব কাতরকণ্ঠে বলিলেন;—"মা, বড় পিপাসা পেয়েছে।"

অতি আদরের কনিষ্ঠপুত্রের কাতরবাক্যে পাষাণী জননীর পাষাণহৃদয় ফাটিয়া দ্রবীভূত হইল। তিনি স্থির থাকিতেন পারিলেন না, অমনি উঠিয়া একঘটি জল আনিয়া বলিলেন ;—"মুখ হাতে পানি দে।"

জহুরুদ্দীন জননীর মুখেরপ্রতি চাহিতেই দেখিতে পাইলেন তাঁহার নয়নযুগলে অশ্রু ডব্‌ডব্‌ করিতেছে, কিন্তু তখনও গড়ায় নাই। জননীর মুখভাব দর্শনে তাহার ক্ষুধা, পিপাসা ক্ষণতরে বিদূরিত হইল—তিনি ভাবিলেন আমারই জীবনের সুখ সন্তোষ নাশিনীকে লইয়া বাটীতে প্রায়ই অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আজিও বোধ হয় তাহারই কিছু হইয়া থাকিবে তাই জননীর চক্ষে অশ্রু সঞ্চার হইয়াছে। এই কথা ভাবিতেই তাঁহার উৎকণ্ঠা চরমে উঠিল, তিনি ব্যগ্রতা সহকারে অথচ অতি কাতরকণ্ঠে বলিলেন ;—"মা, আজি অপনি অমন হয়ে আছেন কেন —বাড়ীতে কি কোন কথা হইয়াছে ?

জননী আর নয়ননীর থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। পুত্র স্নেহ পরবশে তাহার হৃদয় উথালিয়া দুইগণ্ড বহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল, তিনি চক্ষেরজল মুছিতে মুছিতে বলিলেন ;—"হবে আর কি সব তোর পোড়াকপাল, তুই হয়ে মরিস নাই কেন ?"

জহুর উদ্দিন সকরুণ দৃষ্টিতে জননীর মুখেরপ্রতি চাহিয়া বলিলেন ;— "মা, আপনার এ নরাধমপুত্র যেরূপ পাপী তাহাতে সে পাপের তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত না হইলে কি মৃত্যু ঘটিবে—কথা কি তাই বলুন।"

পুত্রের বুকভাঙ্গা কাতরবাক্যে জননীর প্রাণে বড়ই বাজিল। তিনি বলিলেন ;—'তোর আগুণলাগা কপালের কথা পাছে শুনিস আগে মুখ হাতে পানি দে।" এই বলিয়া তিনি সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে জহুর উদ্দিন জলপাত্রটী লইয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্বীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধাজননী রন্ধন আঙ্গিণারদিকে আসিয়া তৈলের বাটীর খোঁজ করিলেন ; কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় উত্তর করিল না—বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইতঃমধ্যে একটা পিতলের বাটী তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া চীৎকার করিতে করিতে কয়েকবার চক্রাকারে ঘুরিয়া থামিয়া গেল। বৃদ্ধা বাটিটা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে তৈল ঢালিয়া পুত্রের নিকট যাইয়া দেখিলেন—তাহার স্নেহের জহুর উদ্দিন শয়ন-শয্যায় পড়িয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছেন।

পুত্রকে কাঁদিতে দেখিয়া জননীও চক্ষের জল থামাইতে পারিলেন না। তিনি তৈলের বাটী রাখিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে পুত্রের নয়নবারি—মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন ;—"পাগল ছেলে কাঁদিস কেন ? কপালের লেখা কি খণ্ডন হয়—তোর কপালে যা আছে তা তোকে ভোগ করতেই হবে। কেঁদে কি করবি চল্ গোসল কর।"

জহুরুদ্দীন বলিলেন ;—"মা, আপনাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি কথা কি হইয়াছে বলুন।" আবার তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

পুত্রের মুখেরপ্রতি চাহিয়া জননীর বুক ফাটিল। তিনি ভাবিলেন, আমি নিজের দোষেই ছেলেকে কাঁদাইতেছি। হায় অবোধমন বুঝিল না কেন! আর একটু ধৈর্য্যধরিয়া থাকিতে পারিলাম না কি কারণে! যদি আর একটু সময় চক্ষেরজল থামাইয়া রাখিতে পারিতাম তাহা হইলে আমার রৌদ্রপ্রপীড়িত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর জহুর উদ্দিন এসময় স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিত। হায় তাহা বুঝিলাম না কেন।

জননী বলিলেন ;—আর দুঃখ করিস না বাবা, অনর্থ দুঃখ করে অসুখ করতে পারে। কথা তেমন কিছু নয়—তবে তোকেই—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুই নাকি কোথায় বিক্রা করতেছিস ?

জহুরুদ্দীনের বুকে ঢেঁকির একটা পাড় পড়িল। তিনি পূর্ব্বে যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা অপসারিত হইয়া অন্যাশঙ্কায় তাহার সন্তপ্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল তিনি লজ্জিতাননে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন; —কেন সে বিষয় কি কোন কথা হয়েছে ?

জননী বলিলেন, "কথা হয়েছে কেমন, কাল থেকে বাটীতে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। না জানি মুছার মা কারমুখে সে কথা শুনে কালথেকে ভাতপানি, কাম-কাজ ছেড়ে বসেছে। বাড়ীর কারুসঙ্গে কথা কহে না, কেবল মুখভার করে শুয়ে বসে থাকছে আর নিজের রাগে অকারণ ছেলেগুলাকে মারছে আর আছ্‌ড়িয়ে আছড়িয়ে পা ফেলছে। এইত এখনই তোকে তেলদিবার জন্য বাটির খোঁজ করায় ঘরথেকে এমন করে বাটিটা ফেলেদিল যে একটুরজন্য আমার পা বেঁচে গেল। বাবা আজ ফয়েজানের মা (চাকরাণীর নাম) ও কাজ করতে আসে নাই। সকাল থেকে সব রান্না পাক আমাকেই করতে হয়েছে। তাও তাহারা খাবে কি না। বাবা দুঃখের কথা আর কতকি বলব—আজ পাঁচপাঁচটা বৌ থাকতে এই বুড়ো বয়সে হাত পুড়িয়ে রান্না করতে হল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ফিঁকরিয়া কাঁদিয়া আবার বলিতে লাগিলেন;—"বাবা আজ সকালে শামসু আমার কাছে এসে চোখ রাঙিয়ে বলে যে, তুই যদি নিকা করিস তা হলে সে এক পয়সাও খরচ দিবেনা এবং পৃথক হবে। সে কড়া কথা বাবা আজকেই জবাব লয়ে পৃথক হবে।"

জহুরুদ্দীনের মস্তকে যেন একযোগে সমস্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্ষোভে, অভিমানে, অপমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় তাহার হৃদয় দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি সে সময় কি কথা বলিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না কেবল সকরুণ উদাস দৃষ্টিতে জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন;—"তিনি পৃথক হয়ে যাবেন ?"

জননী বলিলেন ;—আমি তার মনেরভাব বেশ বুঝতে পেরেছি। বৌ এর ফোঁসে সে সরে পড়বে—পড়বে কি আজকেই বলে পৃথক হবে। তাই ত বলছি তোর পোড়াকপাল। তা না হলে অমন কলাগাছটা তোর গলায় বেঁধে দিব কেন? আর আজ এত ধন সম্পত্তি থাকতেও তুই কাঙ্গাল।

জহুরুদ্দীনের নাভিস্থল হইতে ঘনঘন নিশ্বাস উঠিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি শয়ন-শয্যায় পড়িয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

জননী বলিলেন ;—শুইলি কেন বাবা, চল গোছল কর।

জ।—আমি গোছল করিব না এবং কিছু খাইতেও পারব না, বড়মাথা ধরিয়াছে।

মা।—চল খাবিনা কেন,—খোদা তোরকপালে যা লিখেছে তাই হবে।

জ।—আপনি আর জিদ করিবেন না।

মা।—বাবা তোকে খোদার কছম চল গোছল করে খেয়ে নে।

জ।—আপনি কছম দিবেন না—আমার মাথায় হাত দিয়া দেখুন।

জননী পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া দেখিলেন মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে এবং চক্ষুদ্বয়ও রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়াছে বিধায় তিনি পুত্রকে আর কোন কথা না বলিয়া "হায় খোদা! কি করিলি?" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এদিকে জহুরুদ্দীনের ভয়ানক জ্বর হইয়া রাত্রি হইতে সংজ্ঞা—বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যুবতীর মুখখানি বিষাদে ভরা।

বালিকা।—কেন ভাই আজি তোমার মুখখানি মলিন দেখায়?

যুবতী।—(মনের ভাব গোপন করিয়া) কই বুবু মলিন হবে কেন।

বা।—তুমি মুখে যাহাই বল; কিন্তু আজি যে তোমার মনের বিশেষ ভাবান্তর ঘটিয়াছে তা তোমার মুখই সাক্ষ্য দিতেছে।

যু।—তুমি গণক নাকি?

বা।—গণক নই—তবে লোকে বলে;—মুখ দেখিলেই দেশের বার্ত্তা পাওয়া যায়।

যু।—সত্যি বুবু আজি আমার মন ভাল নাই।

বা।—সোজা মুখে স্বীকার করিলেইত হয়;—আচ্ছা কারণটা কি?

যু।—পোড়া কপালীর দুঃখের কথা কি শুনিবে,—আজি রাত্রিতে আমি তাহার (স্বামী) সঙ্গে বসিয়া রহস্যালাপ করিতেছিলাম। ইতোমধ্যে হঠাৎ পোড়া মুখে একটা না-জবান কথা বাহির হইয়া পড়িল—আমি অমনই দাঁতে জিব কাটিলাম। কিন্তু হায় তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখি মুখখানা কাল আঁধার হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে আমার প্রতি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম—তাই অমনি ভয়ে এবং লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলাম।

বা।—তারপর কি হইল?

যু।—আমি কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কোন কথা বলিতে সাহস পাইলাম না। তিনিও আর কোন কথা না বলিয়া শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ দেখিতে লাগিলেন।

বা।—তার পর তুমি কি করিলে ?

যু।—আমি কিছুক্ষণ পর তামাক সাজিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম ; কিন্তু তিনি তাহা লইলেন না। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রাখিয়া দিলাম।

যু।—তার পর কি হইল ?

বা।—তিনি কিছুক্ষণ কাগজ পড়িয়া পরে ঘুমাইয়া পড়িলেন, তাহা দেখিয়া আমিও ঘুমাইলাম।

বা।—তার পর আর কিছু হয় নাই ?

যু।—আর কি হইবে। এই দেখ এতখানি বেলা হয়েছে এপর্য্যন্ত তিনি মুখ ভার করেই আছেন। আমার সঙ্গে কোন কথা বলেন না। আমিও কথা বলিতে সাহস পাই না।

বা।—তুমি ভাই বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছ।

যু।—তাহাত বুঝিতেছি ; কিন্তু আমি আর কি করিতে পারি।

বা।—রাত্রিতেই তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা লওয়া উচিৎ ছিল। দেখ এবিষয় তোমাকে হাদিসের কথা শুনাইতেছি :—"যে রমণী কুবাক্য প্রয়োগে স্বামীর মনে কষ্ট দেয়—আল্লাহ ও তাহার ফেরেস্তাগণ এবং আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু সে রমণীকে অভিসম্পাত করে।" আর একটী হাদিসে আসিয়াছে,—"যে রমণী স্বামীর নিকট মুখ ভার করিয়া থাকে সে রমণী খোদার ক্রোধে পতিত হয়—তবে যদি পুনরায় স্বামীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে সে রমণীর কল্যাণ আছে।"

হাদিসে এইরূপ আরো অনেক কথা আসিয়াছে ; কিন্তু তুমি কথিত হাদিস দু'টীর সঙ্গে তোমার কার্য্য মিলাইয়া দেখ যে, তুমি কি প্রকার অন্যায় কাজ করিয়াছ ।

যু।—(সজলনেত্রে) বুবু, আমি কি করিব ?

বা।—যাহা করিতে হইবে বলিতেছি—এবিষয় বিবি ফাতেমার একটা ঘটনার কথা শুন ? একদা নবি-কন্যা বিবি ফাতেমা পিতা রসুলের নিকট উপস্থিত হইলে রসুল দেখিলেন তাঁহার নয়নদ্বয় ছল ছল এবং মুখখানা বিষাদপূর্ণ। কন্যার এইরূপ মুখ ভাব দর্শনে রসুল কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন ; "বাবা জান ! অদ্য বিগত রজনীতে আমি এবং আলি উভয়ে বাক্যালাপ করিতেছিলাম ; কিন্তু জানি না কি কারণে হঠাৎ আমার মুখ হইতে এমন একটী কথা বাহির হইয়া পড়িল যাহাতে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। আমি তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম এবং খোদার ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম ;—'হে প্রিয়তম স্বামী আমার। আমায় ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি রাজী হও।' এই বলিয়া তাঁহাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিলাম তাহাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া হাসিলেন।"

বিবি ফাতেমার এই কথা শুনিয়া রসুল বলিলেন ;—"ফাতেমা ! আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি তুমি যদি আলিকে রাজী করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিতে তাহা হইলে আমি কোন মতেই তোমার জানাজার নামাজ পড়িতাম না। তুমি কি অবগত নহ যে স্বামীর রাজীতেই আল্লা রাজী এবং স্বামীর ক্রোধেই আল্লার ক্রোধ। ফাতেমা ! যদি কোন রমণী এমরণের কন্যা বিবি মরিয়মের ন্যায় এবাদত করে অথচ স্বীয় স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারে তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা তাহার সে এবাদত

কবুল করিবেন না। ফাতেমা! ইহাও মনে রাখিও যে, রমণীদের সৎকার্য্যে (হাক্কুল এবাদ) মধ্যে পতিভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; তৎপর চরখা কাটা অপেক্ষা সৎকার্য্য আর নাই।"

যাক্ এর মধ্যে আরও অনেক কথা আছে; কিন্তু এই ঘটনার দ্বারা মিলাইয়া দেখ এখন তোমাকে কি করা উচিৎ। ভাই তুমি না এক দিন বলিয়াছিলে—"আমি পতিভক্তিতে কোনরূপ ক্রটী করি না" এই কি তোমার পতিভক্তি?

যু।—বুবু কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটা দিও না কি করিতে হইবে তাহাই বল।

বা।—বিবি ফাতেমা যাহা করিয়াছিলেন তাহাই করগে। যে প্রকারেই পার হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাও-গে।

যু।—তাহাতে যদি তিনি রাজী না হয়েন?

বা।—তিনি সেরূপ মানুষ নহেন—নিশ্চয় রাজী হইবেন; তবে যদি একান্তই রাজী না হয়েন, তাহা হইলে অন্য উপায় বলিয়া দিব।

যু।—তবে যাই চেষ্টা করে দেখি গে। এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

জহুরুদ্দীন আহমদ সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় পীড়িত। তাঁহার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অদ্য পীড়ার পাঁচ দিবস মাত্র। এই পাঁচ দিবস ধরিয়া রোগী সজ্ঞানে একটী কথাও বলিতে পারেন নাই এবং এক বারের জন্যও চক্ষু উন্মীলন করিয়া চাহেন নাই—তবে প্রলাপ অনেকই বকিতেছেন। তাঁহার পীড়া যেরূপ সাঙ্ঘাতিক তদ্রূপ চিকিৎসা হইতে ছেনা। কেন না টাল অঞ্চলে কোন প্রকার সরকারী বা বেসরকারী চিকিৎসালয় নাই অথচ ভাল চিকিৎসক নাই বলিলেই হয়। তবে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে ভাগ্যক্রমে কৃতান্তের বড়দাদা দুই একজন হাথূড়ে বৈদ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই কৃতান্তের বড়দাদা দ্বারাই জহুরুদ্দীনের চিকিৎসা চলিতেছে। হায় হতভাগ্য পল্লিবাসি চাষাগণ! তোমাদের ভাগ্যাকাশের অভাবতার করাল জলদজাল কতদিনে যে অপ-সারিত হইবে?

অল্প দিবস হইতে কামডোলগ্রামে একটী মাদ্রাসা খোলা হইয়াছে। মাদ্রাসাটী সম্পূর্ণ জাতীয়—মাদ্রাসা। মাদ্রাসাটী জহুরুদ্দীনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। জহুরুদ্দীনের এই পঞ্চম দিবসের পীড়ারদিন মাদ্রাসার অধ্যাপক জনাব মৌলবী সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি যে সময় রোগীর শয়নগৃহে প্রবেশ করেন সে সময় সে গৃহে রমজান আলি ও আবদুল আজিজ নামক জহুর উদ্দিনের দুইজন ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাঁহার

সাহেব রোগীর শয়নশয্যার পার্শ্বে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক রমজান আলিকে বলিলেন ;—"ইনি এখন কেমন আছেন ?" রমজান আলি বলিল,—"অবস্থা বড় ভাল নাই।"

অতঃপর মৌলবী সাহেব রোগীরগায়ে হাতদিয়া দেখিলেন শরীরে ভায়ানক তাপ। তৎপর মাথায় হাতদিয়া একটু হিলাইয়া বলিলেন ;—"কিগো কেমন আছেন ?" রোগী কোন উত্তর করিল না।

রমজান আলী বলিল ;—চাচাসাহেব ব্যারাম হওয়া অবধি এইরূপ কারুর সঙ্গেই কথা বলেন না তবে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা নিজমনেই প্রলাপ বকিতেছেন।

মৌ।—পীড়া সহজ বলিয়া বোধ হয় ;—সহসা এরূপ হইলেন কবে থেকে ?

র।—অদ্য পাঁচ ছয় দিবস হইতেছে একদিন খুবভোরে গোলাগ্রামের কাছারী গিয়াছিলেন ; সেখান থেকে বেলা প্রায় দুইপ্রহরের সময় রৌদ্র মাথায় করিয়া বাটী আসেন ; বাটী আসিয়াই সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হইয়া শয্যা-শায়ী হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেই দিবসকার রাত্রি থেকেই অজ্ঞান অবস্থায় প্রলাপ বকিতেছেন।

এই সময় রোগী একটু অঙ্গ চালনা করিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—"উহুঃ—মা—মা—মা—সে—পানি পানি।" আবদুল আজিজ জল পান করাইল।

মৌ।—চিকিৎসা কে করিতেছে ?

র।—অদ্য তিন দিবস হইতে সিরাজের মা ঔষধ দিতেছে।

মৌ।—এ অঞ্চলে কেহ ভাল চিকিৎসক নাই ?

র।—তেমন কেহ নাই তবে যা একটু মৌলবী হেরাছতুল্লা আছেন। তিনি প্রথম দিবস হাত দেখে বলে গিয়াছেন "পীড়া শক্ত।"

মৌ।—কাল সকালে তাহাকে একবার ডাকিয়া আনিও

এই সময় রোগী আবার অঙ্গচালনা করিয়া বলিয়া উঠিল ; "উহ:—মা—আর—পা—ব—না—পানি—পানি।" আবদুল আজিজ পুনরায় জল পান করাইল।

এই সময় বৃদ্ধা ফিঁক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন ;—"বাবা, বোধহয় আমার জহুরকে হারালেম। আল্লা, আমি কি করলেম! বাবা আমার ছেলেকে হাতে ধরে মেরে ফেল্‌লে। অভাগীর ছেলেকে দু'টা ফুঁকফাক দিয়ে যাও।" এই বলিয়া ফিঁক্‌রিয়া ফিঁক্‌রিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবদুল আজিজ ও রমজান আলির চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

মৌলবী সাহেব বৃদ্ধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ;—"আপনি কাঁদিবেন না ভয়ের কোন কারণ নাই। এ সামান্য পীড়া খোদার ফজলে সত্বরই সেরে উঠবে।"

কান্নাস্বর অপেক্ষাকৃত একটু নরম করিয়া বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন ;—"বাবা আমার ছেলের যেদিন জ্বর হয় তার আগেরদিন হইতেই মুছার 'মা, কার মুখে তার নিকারকথা শুনে মুখ ভারী করে ভাত পানি কামকাজ ছেড়ে বসেছিল। বাবা জানি না—শামসুকে রাত্রে সে কি বলেছিল। শামসু সকালে আমার কাছে এসে চোখ রাঙিয়ে গুটিকত কথা শুনিয়ে দিল। আমি তাকে কতকরে বুঝালেম, কিন্তু সে বুঝবে কি আরো দু'কথা শুনিয়ে চলে গেল। সেদিন ভরা দু'প্রহরে জহুর আমার রোদ মাথায় করে বাড়ী আসে। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে চোখের পানি থামিয়ে রাখ্‌তে পারলেম না; সে আমাকে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি তার দুঃখের কথা মনে করে আর কোন কথাই গোপন করতে পারলেম না—মন একবারে উথলে উঠে পোড়ামুখে সবকথা বেরিয়ে পড়ল। বাছা আমার কথাগুলো শুনে অনেকক্ষণ ধরে

বালিসে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল। আমি তাকে কত বুঝিয়ে গোসল করে খাবার জন্য বললেম; কিন্তু বাবা আমার কোনমতেই খেল না। বাবা কিসে যে কি হল তখনই জ্বর এসে বাবা আমার বেহুস হয়ে গেছে—অভাগীমায়ের সঙ্গে একটী কথাও বলে না। বাছা আমার বাড়ী এসে পানি খেতে চেয়েছিল—জহুর তুই জন্মেরমত পানি খেলি বাবা,—শামসুরা দু'জনে তোকে মেরে ফেললে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

মৌলবী সাহেব বলিলেন;—আপনারা ওসবকথা কিছু মনে করিবেন না। এ সামান্য পীড়া খোদার ফজলে অল্পদিনেই সেরে যাবে। আপনারা বেশ সাবধানতার সঙ্গে দেখা শুনা করিবেন। আমিও প্রত্যহ একবার করিয়া দেখিয়া যাইব। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রমজান আলিকে সঙ্গে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি পথে আসিয়া রমজান আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হাঁ রমজান! এ নিকাতে তোমার পিতা এবং বাটীর অন্যান্য সকলের মত কিরূপ?

রমজান আলী জহুরুদ্দীনের প্রথম ভ্রাতার পুত্র এবং মৌলবী সাহেবের তালেবেইলিম। মৌলবী সাহেব তাহাকে আন্তরিক স্নেহ করেন।

রমজান আলি বলিল;—আপনি ত পূর্ব্বেকার সকল কথাই ছোটচাচার মুখে শুনিয়াছেন। তবে আমার বোধ হয় এখন আর কেহই সেরূপ শক্ত করিয়া বাধা দিতে পারিবেন না অথচ দিলেও টিকিবে না। তবে শামসুচাচা সঙ্গে আছেন তিনি বাধা দিতে পারেন—পারেন কি তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা ত কতক শুনিলেন।

মৌলবী সাহেব কি যেন চিন্তা করিয়া বলিলেন; আমার বোধহয় তোমার ছোটচাচা সেখানে নিকাহ করিবার নিমিত্ত খুবই উন্মত্ত হইয়া

উঠিয়াছিলেন তাই তাহার আশাপথে বাধা পড়ায় ওরূপ হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রলাপের মধ্যেও সেই কথাই আওড়াইতেছেন। আর সে পাত্রীটী যে পরমাসুন্দরী তাহাও আমি অবগত আছি। সে যাহাহউক খোদা করেন তিনি সত্বর সারিয়া উঠিলে যে প্রকারেই হউক তাঁহার নিকাহটা দিয়েদিতে হবে॥

রমজান আলী বলিল;—শামসুচাচার যেরূপ ভাবগতিক তাহাতে সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে বলিয়া মনেহয় না। তবে আপনি যদি মেহেরবানী করেন তাহাহইলে অবশ্য হইতে পারে, কেন না আপনার কথা কাটিতে তাঁহার ক্ষমতা হইবে না।

মৌলবী সাহেব মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—পাগল, মানুষের কি সাধ্য আছে—কাজ খোদার হাতে তবে আমি সাধ্য পক্ষে চেষ্টা করিব। এই বলিয়া তিনি বাসারদিকে চলিয়া গেলেন। রমজান আলী বাটী ফিরিল।

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ।

জহুরুদ্দীনের পীড়া উপশমের কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পীড়া দিন দিন ঊর্দ্ধমুখেই ধাবিত হইতেছে। তাহার দেহের তাপ, মাথার বেদনা, চক্ষের লালিমা এবং প্রলাপ বকার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহার বৃদ্ধা জননী ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতেছেন। তাহার বড়দাদাগণ অহর্নিশ আসিয়া দেখিয়া যাইতেছেন এবং তাহার সাঙ্ঘাতিক পীড়া দর্শনে মনে নানারূপ আশঙ্কা হইলেও কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না; কেন না চিকিৎসকের অভাব। মৌলবীসাহেবও প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাইতেছেন এবং নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে বাটীর সকলকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। বাটীর এবং গ্রামস্থ সকল নর-নারীই তাঁহার পীড়া আরোগ্যের জন্য দিবানিশি কায়মনবাক্যে আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু বাটীর একটী রমণীর সেদিকে আদৌ দৃকপাত নাই। তাহার স্বামী যেরূপ সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় পীড়িত—তাহার একমাত্র শিরোচ্ছায়ার জীবনতরণী খানি অকুলার্ণবে পড়িয়া যেরূপ হাবুডুবু করিতেছে তাহাতে কখন যে অনন্ত জলধির অতল জলে ডুবিয়া যায় সেদিকে তাহার কোনই ভ্রূক্ষেপ নাই—সে সংসারের নানা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত।

এইরূপ অবস্থার মধ্যদিয়া জহুরুদ্দীনের পীড়ার সপ্তম দিবস অতীত হইয়া অষ্টম দিবসে উপস্থিত হইয়াছে। এই অষ্টম দিবসের দিন তিনি কেবল মাত্র সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন।

অদ্য ২৫শা আষাঢ় বুধবার জহুর উদ্দিনের পীড়ার আটদিন। এই তারিখে বেলা. চারিটার পর মৌলবী সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে দর্শন মাত্রই রোগীর নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইল। মৌলবী সাহেব তাঁহার শয়নশয্যার পার্শ্বে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন ;—"একি —আপনি কাঁদিতেছেন কেন ? এ অবস্থায় কাঁদিতে নাই—মনে সাহস করুন—এই প্রায় সারিয়া উঠিলেন।" এই বলিয়া তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন।

জহুর উদ্দিন কাঁদ কাঁদ স্বরে ফিস্ ফিস করিয়া বলিলেন ;—"আর বাঁচিব না—আমাকে—।" এই বলিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মৌঃ।—অত সাহসহীন হইবেন না ইহা অপেক্ষা কঠিন পীড়াতেও মানুষ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। সাহস করুন ভয় নাই।" এই বলিয়া পুনরায় তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।

জ।—জনাব ! অবধারিতে মৃত্যুকে ভয় করিনা এখন মৃত্যুই আমার —বেঁচে আর কি করিব। এই বলিয়া একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মৌঃ।—অমন ভূল বকিবেন না স্থির হউন। অদ্য আপনার কেমন বোধ হইতেছে ?

জ।—কই—কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—পানি। মৌলবী সাহেব স্বহস্তে জল পান করাইলেন।

মৌঃ।—অদ্য আমাকে আপনার অবস্থা কিছু ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে। খোদা করুন সত্বর সারিয়া উঠুন। এইবার সারিয়া উঠিলেই আপনার দুঃখ নিশার অবসান হইবে।

মৌলবী সাহেবের শেষ বাক্যটী জহুর উদ্দিনের হৃদয়ে কি এক দৈব বল সঞ্চার করিয়া দিল। তিনি সহসা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মৌলবী সাহেব ধরিয়া লওয়ায় তাহা পারিলেন না; তবে শয্যায়

পড়িয়াই কএকবার জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া অপেক্ষাকৃত একটু ছোটগলায় বলিলেন,—আপনি মেহেরবানী করিয়া লক্ষীপুর একখানা পত্র লিখুন।„

মৌঃ।—পত্রে কি লিখিতে বলেন ?

জ।—আমার পীড়ার কথা—আভাষে।

মৌঃ।—আচ্ছা তা লিখা যাবে।

জ।—না আজকেই।

মৌঃ।—বেশ এখনই লিখিব। এই আমি চলিলাম। মৌলবী সাহেব সেস্থানে থাকা আর সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না—বিধায় সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

তিনি রোগীর শয়নগৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেখিলেন বৈঠকখানা ঘরে কতিপয় অপরিচিত লোক বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্দ্ধসভ্য গোছের লোক বসিয়া আলবোলা দেবীর মুখ চুম্বন করিতেছে। চুম্বনচোটে দেবী মহাশয়া অবিরাম "গড়ক্" "গড়ক্" রবে প্রাণ ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছেন। লোকটীর মুখ এবং নাসারন্ধ্র দিয়া অনর্গলভাবে ধূমপুঞ্জ উদ্গীরণ হইয়া নাচিতে নাচিতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়! দেবীমহাশয়ার এত প্রাণফাটা চীৎকার শুনিয়াও লোকটীর পাষাণ হৃদয়ে একটুও করুণার উদ্রেক হইতেছে না।

মৌলবী সাহেব অপরিচিত লোক দর্শনে সেই লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের নিবাস কোথায় ?" লোকটী আদব বশতঃ আলবোলাটী অপর একজনের হাতেদিয়া বলিল ;—"জি লক্ষীপুর।"

মৌ।—কোন লক্ষীপুর ?

লোক—জি জেলার নিকট লক্ষীপুর।

মৌঃ।—কোথায় আসা হয়েছে ?

লোক।—এখানেই কিছু জমি লইব মনে করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু কাজ হইল না। মণ্ডলজী (জহুরুদ্দীন) না কি শক্ত বেমার তাই দেখিতে আসিলাম এখনই বাটী ফিরে যেতে হবে।

মৌঃ।—হাঁ তার পীড়া সাংঘাতিকই—আচ্ছা এখনই যাওয়া হবে কি?

লোক।—জি এখনই যাইব।

মৌঃ।—তা কেন—রাত্রে এখানে থাকিয়া সকালে গেলে হয় না?

লোক।—জি না—যখন কাজ হইল না তখন আর থাকিয়া কি হইবে—রাত্রির ট্রেণে বাড়ী চলিয়া যাইব।

মৌঃ। আপনার নাম?

লোক।—খয়রুল্লা শেখ।

মৌঃ।—আচ্ছা যদি একান্তই যাওয়া হয় তাহা হইলে যাইবার সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। আমি আবদুল মতিন বিশ্বাসকে একখানা পত্র দিব। সেখানা আপনাদিগকে পৌছাইয়া দিতে হবে।

লোক।—তা দিব। আপনি লিখুন-গে আমরা আসিতেছি।

মৌলবী সাহেব চলিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

২৬শে আষাঢ়, সকাল বেলা আবদুল মতিন বিশ্বাস তাঁহার সেই ভগ্নবাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন এই সময় খয়রুল্লা শেখ একখানা পত্র আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি পত্রখানা হাতে লইবার সময় বলিলেন ;—কোথাকার পত্র ?

খ।—কামডোল থেকে আনিলাম।

আ।—সেখানে কি কাজে যাওয়া হয়েছিল ?

খ।—জমির জন্ত গিয়াছিলাম ; কিন্তু কাজ হইল না—জহুর উদ্দিন মণ্ডল শক্ত বিমার।

আ।—(উদ্বিগ্নভাবে) কি বল তিনি ব্যারামে ?

খ।—হাঁ আজ সাত, আট দিন হইতে অজ্ঞান অবস্থায় আছে শুনিলাম এখন তখন—বাড়ীতে সব কাঁদা কাটা। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এদিকে আবদুল মতিন বিশ্বাস শশব্যস্তে সেখানে দাঁড়াইয়াই পত্র খানা পাঠ করিলেন। পত্রপাঠে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার মাতুলালয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তিনি বাটী আসিয়া স্বীয় শয়ন খট্টায় উপবেশন পূর্ব্বক জহুরুদ্দীনের পাড়ার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। নানাবিধ আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধীভূত হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার আন্তরিক ভাব বাহিরে ফুটিয়া মুখখানাকে একেবারে বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল।

তিনি এইরূপ নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রীটী ফুল্লানলে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বামীর মুখের প্রতি চাহিবা মাত্রেই তাহার মুখের প্রফুল্লভাব তাহাকে ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল। সে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল;—"তুমি অমন হয়ে বসে আছ কেন?" তিনি পত্নীর কথায়—মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন, "কেমন হয়ে?"

স্ত্রী।—ভারী হয়ে।

স্বা।—ভারী হইবার একটু কারণ হয়েছে।

স্ত্রী।—কি কারণ—আমাকে বল।

স্বা।—তুমি সে কথা শুনিয়া কি করিবে?

স্ত্রী।—না তুমি বল।

স্বা।—কারণ তেমন কিছুই না তবে যাহার সঙ্গে হুথীর নিকার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল তিনি শক্ত ব্যারাম।

স্বামীর বাক্যে সুন্দরী কামিনীর অন্তরাত্মা ধড়াস করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এবং উদ্বিগ্নভাবে বলিয়া উঠিল;—তুমি বল কি—এ খবর কোথা পেলে? তবে কি আল্লা বুবুজানের কপালে সুখ লিখে নাই।

স্বামী।—এই দেখ সেখানকার পত্র এসেছে।

তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন এই সময় তাঁহার মাতুল সাহেব "আবদুল মতিন" বলিয়া ডাকিলেন। তিনি "আসি" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন,—আপাততঃ তাহার পীড়ার কথা কাহাকেও বলিও না। এই বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পত্রখানা শয়ন খট্টার উপরেই পড়িয়া থাকিল। পতি চলিয়া যাইবার পর পত্নীও ঘর হইতে বাহিরে গেল।

সন্ধ্যার একটুপূর্ব্বে হুথী কার্য্যবশতঃ তাহার দাদার শয়নগৃহে যাইয়া

দেখিল বিছানায় উপর একখানা পত্র পড়িয়া আছে। বালিকা পত্র খানা হাতে লইয়া সেস্থানে দাঁড়াইয়াই পাঠ করিতে লাগিল; কিন্তু হায়! পত্রপাঠ করিতে করিতেই "হায় আল্লা তুমি কি করিলে!" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। অমনই তাহার কৃষ্ণাভ আয়ত নয়নযুগল হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া উষ্ণাশ্রু গড়াইয়া গোলাপী গণ্ডদ্বয় বহিয়া বক্ষঃ বসন চুম্বন করিতে লাগিল। ভাবীপতির পীড়ার কথা পাঠে সরল অন্তঃকরণা কোমলমতি বালিকার হৃদয়ের তরুণ অঙ্কুরিত আশামূলে দারুণ কুঠারাঘাত হইল। ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডখানি দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। বালিকা পুনর্ব্বার পত্রখানা পাঠ করিবার ইচ্ছা করিল; কিন্তু পারিল না, কেন না এবার পত্রের লেখাগুলি তাহার চক্ষের সামনে ধূমাকার বোধ হইতে লাগিল, বিধায় এবার সে পত্রখানা ভাল করিয়া পড়িতে পারিল না এবং যাহা পড়িল তাহাও যেন ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে পত্রখানা সেখানে রেখেই বুকে হাত চাপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমে দিনের আলো নিবিয়া রাত্রি হইল। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাবাতি জ্বলিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল। এই সময় বাটীর পুরুষদিগের নৈশাহার শেষ হইলে দুখীর জননী আহারে বসিবার সময় তাঁহার জনৈক পুত্রবধূকে দুখীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। বধূটী একটু পর আসিয়া বলিল, "বুবুজান রাত্রিতে খাইবে না।" অতঃপর সকলে আহারক্রিয়া সমাপন করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যামিনী নিস্তব্ধ—নিজ্‌ঝুম। শুক্লপক্ষ সপ্তমীর ক্ষীণচন্দ্র স্বীয়পালা সমাপ্ত করিয়াছে। লক্ষ্মীপুরগ্রামে দুই একটী গৃহ-মৃগের "খাঁউ খাঁউ" শব্দ ব্যতীত অন্য কোন জীবের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। এই সময় বালিকা দুখী তাহার শয়নগৃহে বসিয়া নিজের অদৃষ্ট বিষয় চিন্তা করিতেছে। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন সে একটী চিন্তামূর্ত্তি সংস্থাপিত। অন্ত-তাহার হৃদয়নদীতে কতইযে চিন্তাতরঙ্গ ক্রীড়া করিতেছে তাহার পরিসীমা নাই। জহরুদ্দীনের পীড়ার কথা পাঠে তাহার সরল কোমল অন্তঃকরণ ফাটিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্রমতি বালিকা মনের বেদনা, হৃদয়ের দুঃখ আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না—মনেরকষ্টে প্রাণের জ্বালায়—দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার কোমলাঙ্গের লাবণ্য মুখের জ্যোতিঃ একেবারেই মলিন হইয়া উঠিয়াছে।

কথা চাপিয়া রাখা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ বুকভাঙ্গা দুঃখের কথা কে কতক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারে? বিয়োগ, বিচ্ছেদ, নিরাশাজনিত দুঃখে কাহার না হৃদয় ফুলিয়া ফাঁফিয়া উঠে। ইচ্ছা করিলে—অত্যন্ত সংযমী হইলে অন্যের সঙ্গে কথা নাও বলা যায়; কিন্তু মনের সঙ্গে কথা না বলিয়া পারা যায় না। বালিকা অসহনীয় মনের দুঃখে স্বগত বলিতে লাগিল;—দুনিয়াতে কি সুখ নাই? এই পাপ তাপপূর্ণ ধরাধমে সুখের আশা কি কেবলই দুরাশা? হায় মায়াবিনী দুনিয়া! তোমার হৃদয়ে যদি বিন্দুমাত্রও সুখের লেশ থাকিত তাহা হইলে এই অভাগী বালিকার কপাল

যে আমাকে ভাঙ্গিবে কেন? হায়! আমি কোন অপরাধে অপরাধিনী? বিধাতা কেনই অকাল মণিহারা ফনিনীর ন্যায় শোভাহিনা করিলেন? জানিনা কোন পাপের ফলে তরুণ বয়সে নিদারুণভাবে হৃদয়ে দাবানল জ্বালিয়া দিলে। আমি এমন কি মহাপাতক করিয়াছি যে তাই আমার ভাগ্যতরুতে বিষময় ফল ফলাইতেছেন। আমার অতি যত্নের—অতি আদরের আশালতা কেনই বা ছিন্ন করিবারকৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। দয়াময়! তুমি কি তোমার এই ক্ষীণহৃদয়া পাগলী দাসীকে পরীক্ষা করিতেছ? কিসের পরীক্ষা করুণানিদান! আমি কি তোমার আজ্ঞাধীনা নহি?

পত্রে তাহার পীড়ার কথা যেরূপ পড়িলাম; উহুঃ! দয়াময়! তুমি না দয়ার আধার? তুমিই না রাহমানের-রাহিম? তবে অমন ফোটা ফুলের মত—অমন স্বর্গীয়ভাব বিজরিত—অমন পবিত্রতা মাখা মুখখানা শুকাইতে বসিয়াছ কেন? অমন আদরোপযুক্ত সখেরফুলে দুরন্তব্যাধি কীটের প্রবেশাধিকার দিলে, কোন দয়াগুণে দয়াময়! অমন শরতের পূর্ণেন্দুর ন্যায় নাজুক-শরীরে রোগ-রাহুর গ্রাসাধিকার দিলে কোন করুণাগুণে করুণা নিদান! কেবল কি দাসীকে পোড়াইবার নিমিত্ত এ আভীর করিতেছ? দাসী তাহাকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিয়াছে—তাহাই কি অপরাধ? ভালবাসা কি পাপ? পবিত্র ভালবাসা কি তোমার বিধান নহে? হে জগত্তারণ বিপদবারণ কৃপানিদান আল্লাহ-তায়ালা! তুমি তাহাকে রক্ষা কর। সত্ত্বর নিরাময় কর। অনাথ নাথ! অবলা হৃদয় আর দগ্ধাইও না। দীনা-হীনা অনাথিনী দাসীর বুকভাঙ্গা মোনাজাত কবুল কর। তাহার পবিত্র প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য যাহা করিতে হয় তাহা বলিয়া দাও। যদি বুক চিরিয়া কলিজা ছদকা করিতে হয় অথবা তাহার পবিত্রপ্রাণের বিনিময়ে দাসীর এ ক্ষুদ্রপ্রাণ তোমার নামে উৎসর্গ করিতে হয় অনুগ্রহ

পূর্ব্বক তাহাও বলিয়া দাও—দাসী অকাতরে সে সকল কার্য্য—করিতে প্রস্তুত আছে ; কিন্তু দয়াময় ! অকালে তাহার প্রাণপাখীটী কাড়িয়া লইও না। প্রভো ! দাসীকে আর কত কাঁদাইবে ? অগতির গতি ! মাতা পিতার নিকট যখন যে আবদার করিয়াছি—যখন যে বস্তুটী পাইবার জন্য কাঁদিয়াছি—তখনই তাহা পাইয়াছি—তুমি কি মাতা পিতা অপেক্ষা —দয়াবান নহ ?

বালিকা এইরূপ—মন্ত্রণা মথিত হৃদয়ে—সকরুণ বিলাপোচ্ছ্বাসে খোদা তায়ালাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া ভাবিপতির পীড়ারোগ্যের নিমিত্ত কায়মন বাক্যে মোনাজাত করিতে করিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল।

ক্রমে এক দুই করিয়া যামিনীর যামত্রয় অতীত হইয়া ২৭শে আষাঢ় শুভ-শুক্রবারের প্রভাত হইল। বালিকা শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক ফজরের নামাজ পাঠান্তে কোরআন শরীফ তেলাওত করিতে বসিল এবং কিছুক্ষণ পাঠ করতঃ জুজদানে বন্ধ করিয়া পুনরায় যন্ত্রণা কণ্টকিত উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তাগুলি শ্মশানচারী প্রমথের ন্যায় স্ব স্ব লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া বালিকাকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল।

বালিকা পত্র পাঠাবধি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহার সে অবস্থার প্রতি বাটীর কেহই তত্তদূর লক্ষ্য করে নাই। বেলা প্রায় নয় ঘটিকার সময় তাহার বড়ভাবী তাহার নিকট আসিয়া দেখিল সে মলিনমুখে শয়ন করিয়া মৃদু মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। বধূটী তাহার মুখের কাছে গিয়ে বলিল ;—"বুবুজান তুমি অসময়ে শুয়ে আছ কেন ? তোমার কি সময় অসময় নাই—বেলা হইয়াছে গোছল করিয়া খাবে না ?" দুখী বলিল,—"আমার ক্ষিধে পায় নাই।" বধূটী আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার একটু পর তাহার জননী আসিয়া বলিলেন,—"দুখী তুই অসময় শুয়ে আছিস্ কেন—বেলা হয়েছে খাবি না?" দুখী বলিল,—"আমার অসুখ করেছে এখন খাইতে পারিব না।" জননী বলিলেন,—"মা তোর অসুখই যে কেমন তা বরাবর হতেই থাকে।" এই বলিয়া তিনিও চলিয়া গেলেন।

ক্রমে বেলা ১২টা হইল। গ্রাম্য মছজিদে জুমার নামাজের আজান হইল। দলে দলে নামাজিগণ আসিয়া মসজিদে সমবেত হইতে লাগিল। এই সময় দুখী তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নি রাহেলা খাতুনকে কাছে ডাকিয়া বলিল,—"মা'জানকে বল্‌গে তিনি যেন আমার দারগা ও জমাদারকে মছজিদে পাঠিয়ে দিয়ে ভাইজানকে নিজহাতে জবেহ করিয়া দিতে বলেন।" রাহেলা খাতুন ছুটিয়া গেল।

ইহার একটু পর দুখীর ছোটভাবী দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—"বুবু,—তুমি নাকি তোমার দারগা ও জমাদারকে ছদ্‌কা করলে?" দুখী বলিল,—"হাঁ।" ভাবী বলিল;—"ধন্য তোমার পাষাণ কলিজা! তুমি কেমন করিয়া অমন প্রাণসম আদরের প্রতিপালিত খাসি জোড়া ছদকা করিলে—যে দু'টীকে তুমি প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতে।" দুখী বলিল,—"আল্লার রাহে প্রিয়বস্তই দিতে হয়।"

তাহাদের এই পর্য্যন্ত কথা বলা হইয়াছে ইতোমধ্যে দুখীর জননী আসিয়া বলিলেন;—দুখী, তুই নাকি তোর খাসী দু'টি ছাদকা করিলি? দুখী বলিল;—হাঁ তাহাই করিলাম। জননী বলিলেন;—অমন আদরের পালিত খাশিজোড়াকে ছদকা করিবি কেন?—অন্য এক জোড়া কিনে দিলে হয় না?—দুখী বলিল;—কেন আপনি কি নিষেধ করিতেছেন? জননী বলিলেন;—না-মা নিষেধ করিব কেন? আল্লার রাহে দিবি সেত

মানুষ করার মত করে সে দু'টাকে পুষেছিস। দুখী বলিল;—মা, পিয়ারা বস্তু আল্লার রাহে না দিলে নেকী পাওয়া যায় না এ কথাত আপনার মুখেই শুনেছি। মা বলিলেন;—তাত সত্যি—আচ্ছা পাঠিয়ে দিতেছি। এই বলিয়া তিনি খাসী জোড়া মছজিদে পাঠাইয়া দিলেন। জুমায়ার নামাজের পর আবদুল মতিন বিশ্বাস সেদু'টীকে স্বহস্তে যবেহ্ করিয়া দিলেন।

* * * * *

সেইরূপ অনশন অবস্থাতেই দুখীর সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিতে তাহার জননী আহারে বসিবার সময় রাহেলা খাতুনকে তাহাকে আহারের জন্য ডাকিতে পাঠাইলেন। রাহেলা ফিরিয়া আসিয়া কহিল;—"বুবুজান রাত্রে কিছু খাবেন না।"

এক দিন রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে অথচ মেয়ে কিছুই আহার করে নাই এবং এখনও খাইতে চাহিতেছে না এই কথা ভাবিয়া জননীর মন যেন কেমন হইয়া উঠিল, তাই তিনি পুত্রবধূদ্বয়কে বলিলেন;—"দুখীর যে কোনরূপ অসুখ করেছে তাত বুঝা যায় না—তবে সে দিন রাত্রি অনাহারে আছে এবং এখনও কিছু আহার করিতে চাহে না—আমি জিজ্ঞাসা করিলেও ত সে কিছু বলিবে না—তোমরা তাহার অনাহারের কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ মা? তার অবস্থা দেখে মনে বড়ই কষ্ট হইতেছে। মা আমার বড়ই দুখিনী মেয়ে।"

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া ছোট বধূটী বলিল;—কি জানি মা, আমাকেওত বুবুজান কিছু বলে নাই। বিশেষতঃ সে যেরূপ গম্ভীর মেজাজের মানুষ তাহাতে তাহার মনের কথা বাহির করাও সহজ কথা নহে। তবে কাল সকালে তার (স্বামী) কাছে কামস্কোল থেকে এক খানা চিঠি এসেছে। কাল সকালে তিনি সে চিঠিখানা হাতে করে মলিনমুখে বসে ছিলেন।

আমি তার মুখের ভাব দেখে কারণ—জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছু না বলে এই মাত্র বলিলেন ;—"চিঠির খবর ভাল নয়" আমার বোধ হয় বুবুজান তাহারই কিছু শুনিয়া থাকিবে—তাই ভাত পানি ছেড়ে বসেছে।

গৃহিণীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আর এক মুঠা অন্নও উদরস্থ করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ অন্ন থালা ত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"আবদু কাল কামডোল থেকে কোন চিঠি এসেছে কি ?"

আ।—হাঁ, এসেছে।

মা।—কে লিখেছে ?

আ।—সেখানকার মৌলবী সাহেব।

মা।—খবর কি ?

আ।—জহুর উদ্দিন পীড়িত।

মা।—কি রকম পীড়িত ?

আ।—পীড়া সাজ্ঘাতিক। অদ্য ৮।৯ দিবস হইতে অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। খরুল্লা মামু দেখিয়া আসিয়াছেন তিনি বলিলেন "তার জীবনের আশা নাই বাড়ীতে সকলে কাঁদা কাটা করিতেছে।" আপনাদের দুঃখ বৃদ্ধি হইবার ভয়ে কাল থেকে সে কথা বলি নাই।

গৃহীণীর চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বুকে হাত চাপিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িলেন। পরন্তু জহুর উদ্দিনের পীড়ার কথা শুনিয়া বাটীর সকলেই দুঃখ প্রকাশ—করিতে লাগিলেন এবং সকলেই তাহার পীড়া আরোগ্যের জন্য কায়মনবাক্যে খোদার নিকট দোওয়া করিতে লাগিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

২৮শে আষাঢ় শনিবার সকালে মৌলবী সাহেব জহুরুদ্দীনকে দেখিতে আসিলেন। তিনি রোগীর শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া রোগীরপ্রতি চাহিতেই বুঝিতে পারিলেন রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ। তাহার রোগ এবং রোগের উপসর্গ সমূহ কিছুই নাই। শরীরে হাত দিয়া দেখিলেন—শরীর বেশ শীতল। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন;—"অদ্য আপনার কেমন বোধ হইতেছে?"

জহুরুদ্দীন একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন;—বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। শরীরে আর কোন পীড়া আছে বলিয়া বোধ হইতেছে না। গত রাত্রি হইতে হঠাৎ—শরীর হালকা হইয়া উঠিয়াছে।

মৌঃ।—খোদার ফজলে আপনার পীড়া সারিয়া গিয়াছে।—অন্যান্য দিবস যে সকল লক্ষণ দেখা যাইত অদ্য তাহার কিছুই নাই শরীরটা বেশ শীতল হইয়া উঠিয়াছে। খোদা চাহিলে কাল পথ্য করিতে পারিবেন।

জ।—এ যাত্রা রক্ষা পাইব বলিয়া আদৌ আশা করিতে পারি নাই; কিন্তু রাত্রি হইতে কি যেন মন্ত্রশক্তি বলে পীড়া উপশম হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

মৌঃ।—ভাই, আল্লাহ তায়ালার অসাধ্য কাজ কি আছে—তিনি আপনার এই পীড়াটুকু মন্ত্রশক্তির ন্যায় আরোগ্য করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?

জহুরুদ্দীন মনে মনে বলিলেন ;—"তিনি মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করিতে পারেন বটে; কিন্তু সকল কার্য্য সেরূপ করেন না-কেন ?" এই কথাটী ভাবিতেই তাহার নয়নদ্বয় ছল ছল হইয়া উঠিল এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া ত্যাগ পূর্ব্বক বুকভাঙ্গা কাতর স্বরে বলিলেন ;—"জনাব ! তিনি আমায় রক্ষা করিলেন কেন ?" বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইল।

মৌঃ।—অমন কথা বলিবেন না—মৃত্যুকে আহ্বান করিতে নাই। এবিষয় হাদিসে নিষেধ আছে। এই বলিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

জ।—জনাব ! আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তির বাঁচিয়া ফল কি ?

মৌ।—আপনি দুঃখ করিবেন না—আর কোন বাধা নাই।

জহুরুদ্দীনের মৃতদেহে যেন নব-জীবন সঞ্চার হইল,—তিনি আবেগ-ভরে বলিয়া উঠিলেন ;—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?

মৌঃ।—স্বপ্ন নয় সত্য—দু'টা আহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

জ।—মিথ্যা কথা—আপনি কি অতদূর করিতে পারিয়াছেন ?

মৌঃ।—(ঈষদ্ধাস্যে) আমাকে কি কোন দিন মিথ্যা বলিতে দেখিয়াছেন ?

জহুরুদ্দীনের দুর্ব্বল হৃদয় ধড়াস্ করিয়া নাচিয়া উঠিল। কি যেন এক দৈবশক্তি প্রভাবে তাহার রোগ ক্লিষ্ট কলেবরে নববলের সঞ্চার হইল। তিনি সহসা উঠিয়া বাসিবার চেষ্টা করিলেন;—কিন্তু বিফল চেষ্টা, পারিলেন না। মৌলবী সাহেব তাহাকে ধরিয়া লইয়া বলিলেন ;—ও কি করিতেছেন—অসুস্থ শরীর পড়িয়া যাইবেন। জহুরুদ্দীন দুই তিনবার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন;—খুলিয়া বলুন।

আশা তোমার কি কুহক! প্রেম তোমার কি আশ্চর্য্য প্রভাব!

স্বীকার করি তুমি অন্ধ—তোমার হিতাহিত জ্ঞান নাই—বিবেচনা শক্তি নাই—ভালমন্দের ইতর বিশেষ নাই—সবল দুর্ব্বলের বাছাবাছি নাই; কিন্তু তুমি কোন ক্রমেই দুর্ব্বল নহ। তুমি অপ্রতিহত গতিতে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবেই রাখিবে। তোমাকে ধন্য!

মোঃ।—সবুর করুন পরে সকলই জানিতে পারিবেন।

জ।—না এখনই।

মোঃ।—আমি অনেক চেষ্টা করিয়া শামসুদ্দীনকে রাজী করিয়াছি। তিনি আর কোন আপত্তি করিবেন না; তবে কাবিন নামায় জমি লিখিয়া দিতে হইলে কেবল আপনারই অংশের দিতে হইবে।

জ।—কেবল জমি কেন প্রাণ লিখিয়া—। কিন্তু তিনি পৃথক ত হইবেন না?

মো।—না—আর কোন কথা নাই।

জহুরুদ্দীন আবেগ ভরে মৌলবী সাহেবের হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন;—জনাব! আপনি এ অধমকে কিনিয়া লইলেন। জনাব! দুনিয়াতে আমার যে আর কেহই নাই। আবার তাহার চক্ষে জল আসিল।

মো।—আপনি অনর্থক দুঃখ করিবেন না এবং এ অবস্থায় আর অধিক কথাও বলিবেন না কি জানি অসুখ বাড়িতে পারে।

জ।—আপনি লক্ষ্মীপুর এক খানা পত্র লিখুন।

মো।—কি বিষয়?

জ।—এখান হইতে লোক যাইবে।

মো।—"আচ্ছা লিখিব" এই বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

ত্রয়োদশ দিবস পীড়া ভোগ করিয়া জহুরুদ্দীন পথ্য পাইলেন।

তাহার পথ্য পাইবার কএক দিবস পর মৌলবী সাহেব জহুরুদ্দীনের পক্ষ হইতে আবদুল মতিন বিশ্বাসকে এই মর্ম্মে এক খানা পত্র লিখিলেন :—

তসলিম !

আমার পীড়ার কথা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। খোদার ফজলে উক্ত পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আগামী ১৪ই শ্রাবণ বুধবার আপনার ওখানে লোক যাইবে। আমার সালাম বাটীর সকলকে জানাইবেন, ইতি— ।

যথা সময়ে পত্র পাইয়া আবদুল মতিন বিশ্বাসের বাটীতে আনন্দের ঢেউ উঠিল; দুখী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জেহরুদ্দীন প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। এখন তিনি যষ্টির আশ্রয় না লইয়াও স্বেচ্ছায় উঠা বসা, চলা ফিরা ইত্যাদি করিতে পারিতেছেন। এই সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের পোষিত মুকুলিত আশাকলিকাও দ্বিগুণ বলে বলিয়ান হইয়া প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে বালিকাটী তাহার চক্ষে নলিন-নয়না সুচারু-বদনা অপার্থিব সুন্দরী ভুবন মোহিনী প্রেম-প্রতিমারূপে প্রতিভাত হইয়াছে সেই সুন্দরী বালিকার কর-পল্লব-স্খলিত বরমাল্য কণ্ঠাভরণ করিবার আশায় পরিমলাকুল লব্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় তাহার মন যার পর নাই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মৌলবী সাহেবের মুখে শুনিয়াছেন,—১৩ই শ্রাবণ লোক যাইবার কথা লেখা হইয়াছে এখন সেই শ্রাবণই, তাঁহার ধ্যান। তিনি মনে মনে সেই দিনটাকে কতইনা আহ্বান করিতেছেন; কিন্তু যাহার প্রতি যতই আগ্রহ প্রকাশ করা যায়;—যাহাকে ধরিবার জন্য যতই অগ্রসর হওয়া যায় সে ততই সারিয়া যায় কেন? তাহার প্রতি সে সেরূপ আগ্রহ দেখায় না কেন? সে তার ইচ্ছানুরূপ ধরা দেয় না কি কারণে? কই সে দিন ত আর সহজে আসিতে চাহে না! কেনইযে সে দিনটা আসিতে-ছেনা—কি কারণেই বা আসিতে আসিতেও সরিয়া যাইতেছে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে?

আত্মহারা জহুরুদ্দীন দিন রাত্রিতে শত শতবার দিন গণনা করিয়া ১৪ই শ্রাবণ বুধবারকে নিকটে আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন এই সেদিন

আসিল—না আসিল না—আবার আসিল—না আসিল না—পুনরায় আসিল—এ আবার কি? আবার যে সরিয়া গেল। এবার নিশ্চয়ই আসিল—অন্তই ১৪ই শ্রাবণ বুধবার।

লোকে কথায় বলে "যার গরু পাঁকে পড়ে তার হুনো জোর হয়" জহুর উদ্দিন সেই অবস্থাতেই, লক্ষীপুর যাইবার জন্য নিজের মন মত লোক ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন তন্মধ্যে মৌলবী সাহেবকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। মৌবলী সাহেব যাইবেন না বলিয়া অনেক আপত্তি করিয়া —কত ওজর দেখাইয়াও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন নাই।

ঘটনার সকল কথা বিস্তারিত ভাবে বলিতে গেলে পুস্তকের বলেবর বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে পাঠক পাঠিকাগণেরও বিরক্তির কারণ হইয়া পড়ে। রাত্রিতে জহুর উদ্দিন মৌলবী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে অনেক কথা বলিয়াছেন—এবং তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন ;— সেখানে দেনা পাওনার বিষয় সাধ্যাধিক চার্জ্জ হইলে সাধ্য পক্ষে কমাইবার চেষ্টা পাইবেন ; তবে যাহা কমি করিতে না পারেন তাহা স্বাকার করিয়া লইবেন। অধিক বলিয়া কোন মতেই পশ্চাৎপদ হইবেন না।

নির্দ্ধারিত দিবস অতি প্রত্যুষেই মৌলবী সাহেব গ্রামের দুইজন লোক সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন এবং সকাল সাতটার ট্রেণ ধরিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি পাণ্ডুয়া (বর্ত্তমানে একলক্ষী) ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখিতে পাইলেন অনেকগুলি লোক প্লাটফরমে কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ পাদচারী করিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছে। প্লাটফরমের নৈঋত কোণে একটী বালিকাও একেলাটি বসিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতেছিল। বালিকার বয়স ১৪।১৫ বৎসরের অধিক হইবে না। তাহার দেহের বর্ণ ও গঠন বেশ উজ্জ্বল ও সুন্দর। শরীরের কোন স্থানে কোন প্রকাশ অলঙ্কার নাই। পরণে কাল ইঞ্চি

পাড়ের এক খানা ভুনি এবং বক্ষঃদেশ হইতে নিম্ন ভাগের কাপড় আর্দ্র। সে যে কোন খানে হাটিয়া জল পার হইয়া আসিয়াছে তাহা তাহার আর্দ্র বস্ত্র দেখিয়াই বুঝা যাইতেছিল। তাহার পার্শ্বে একটা পুলিন্দা রক্ষিত পুলিন্দাটী দেখিয়া বোধ হইতেছিল তাহাতে দুই এক খানা পুস্তক ও কাপড় চোপড় আছে। বালিকাটী এমনই সুন্দরী যে প্লাটফরমের অধিকাংশ লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বালিকাটী যে কোন মুছলমান ঘরের কুলবালা তাহা তাহার চেহেরা মোহরা এবং হাব ভাব দেখিয়াই বোধ হইতেছিল। বালিকার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই যেন মৌলবী সাহেবের মনে কি এক প্রকার সন্দেহ হইল; তখন বালিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার সময় ছিল ন, কেন না ইতোমধ্যেই ষ্টেশন মাষ্টার "বিদেশী বিদেশী" (কুলির নাম) বলিয়া ডাকিয়া বলিলেন;—"সামনী গাড়ী ছোড়।"

বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই "টন্‌টন্ ঠন্‌ঠন্" করিয়া ঘণ্টাধ্বনি হইল। তাহা শ্রবণে যাত্রিগণ স্বস্ব গন্তব্য স্থানের টিকিট ক্রয় করিতে লাগিল। এই সময় উল্লিখিত বালিকাও উঠিয়া পার্শ্বস্থ জনৈক লোকের হাতে কিছু পয়সা প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় গন্তব্য স্থানের টিকিট ক্রয় করাইয়া লইল। দেখিতে দেখিতে "গোস্ গোস্ হুস্ হুস" করিতে করিতে গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। যাত্রিগণ তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া আরোহণ অবতরণ করিতে লাগিল। অতঃপর পুনর্ব্বার ঘণ্টাধ্বনি হইল, তৎশ্রবণে আবার গাড়ী খানা "গোস্ গোস্—হুস্ হুস ঝক্‌ঝক্" করিতে করিতে ষ্টেশন ত্যাগ করিল।

গাড়ীখানা নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যথা সময়ে মালদহ ষ্টেশনে থামিল। আবার যাত্রিগণ আরোহণ অবতরণ করিতে লাগিল। মৌলবী সাহেবও সঙ্গিদ্বয় সহ নামিয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বালিকাটী ও যে লোকটা তাহাকে টিকিট ক্রয় করিয়া

দিয়াছিল উভয়ে গাড়ীর পৃথক পৃথক কামড়া হইতে অবতরণ করিল; কিন্তু অবতরণ মাত্রই বালিকা লোকটাকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিয়াই পুনর্ব্বার গাড়ীতে উঠিয়া গেল। এদিকে লোকটা ইংরাজ-বাজারের পথ ধরিল।

মৌলবী সাহেব পথে যাইতে যাইতে লোকটাকে জিজ্ঞাসা বালিকার বিষয় কতক কথা অবগত হইলেন; কিন্তু অবগত হইয়া আক্ষেপ ভিন্ন অন্য কিছু করিতে পারিলেন না কেন না তখন গাড়ীখানা ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু লোকটা যে বালিকাকে টিকিট ক্রয় করিয়া দিয়াছিল সে জন্য তাহাকে দু'টা মিষ্ট কথা হইতে বঞ্চিত করিলেন না। (১)

সে যাহা হউক মৌলবী সাহেব সঙ্গিদ্বয় সহ রেলওয়ে ঘাটে মহানন্দ নদী পার হইয়া হইয়া ইংরাজ বাজারে প্রবেশ করিলেন এবং সে খানে একটু বিশ্রাম করিবার পর লক্ষ্মীপুরের পথ ধরিলেন। লোকটা ইংরাজ বাজারেই থাকিয়া গেল।

মৌলবী সাহেব সঙ্গীদ্বয় সহ বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় লক্ষ্মীপুর পৌহছিলেন। আবদুল মতিন বিশ্বাস মেহমানগণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপর মেহমানগণকে পরিতৃপ্তির সহিত পানাহার করাইয়া আত্মীয় স্বজন ও গ্রাম্য গণ্যমান্য দুই চারিজনকে ডাকাইয়া কথা—আরম্ভ হইল।

কোন কারণ বশতঃ একস্থানে পাঁচজন লোক সমবেত হইলে একথা সেকথা পাঁচ কথাই হইয়া থাকে, অদ্যকার মজলিসেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না! কথায় বাড়াবাড়ি দেখিয়া মৌলবী সাহেব বলিলেন;—"কথায়

---

(১) জীবনে কুলাইলে "বালিকার সাহস" নামক গ্রন্থে এই বালিকার বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

কথায় সময় নষ্ট হইতেছে আমি মনে করি এখন মুল কথাটা হইলেই ভাল হয়।”

অতঃপর কথা আরম্ভ হইল। প্রথমে রাজী-রেজামন্দিরে কথা শেষ হইয়া দেনা পাওনার কথা উঠিল। আবদুল মতিন বিশ্বাস প্রথম প্রথম খুবই চাপিয়া ধরিলেন; কিন্তু অনেক কথা কাটাকাটির পর সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে সাব্যস্ত হইল;—দুলাপক্ষকে ৪৫ বিঘা জমির কাবিন নামা লিখিয়া দিতে হইবে এবং ২৫জোড়া কাপড় দিতে হইবে তন্মধ্যে ৪ জোড়া রেশমী বাকী ২১ জোড়া সূতী। ইহা ব্যতীত ৫০০৲ টাকার অলঙ্কার দিতে হইবে। এইরূপে—যাবতীয় দেনা পাওনার কথা শেষ করা হইল।

তৎপর ৮ঠা রমজান ২৩শে শ্রাবণ শুভ শুক্রবার নিকাহের দিন ধার্য্য করিয়া মৌলবী সাহেব সঙ্গিদ্বয় সহ কামডোল ফিরিলেন। উভয় পক্ষের বাটীতেই নিকাহের ধুম পড়িয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুজনী কাঁথা সেলাই করিতে করিতে যুবতী বালিকাকে বলিল;—

ভাই তোমার সেদিনকার কথা মত কাম করে আমি যেরূপ ফল পেয়েছি তাহাতে জীবনেও তোমার সে উপকারের কথা ভুলিতে পারিব না; —মানুষকে যেমন হাতে ধরে দোজখ হইতে বাহির করে তুমি সেইরূপ আমাকে বাহির করেছ। আজিও সে বিষয় দু'চারটী কথা বলে বাঁদীকে সরফরাজ কর।

বা।—(রহস্যভাবে) তোমার অতবড় কাম করিয়া দিয়েছি তার বখসিস—।

যু।—(মুচকি হাসিয়া) হাঁ ভাই তোমার সে দিন কাছিয়েছে।

বা।—না ভাই তোমার সঙ্গে পেরে উঠবার যো নেই—তুমি বড়ই মুখরে;—আচ্ছা শুন;—তুমি ভক্তি সহকারে স্বামী সেবায় নিযুক্ত থাকিও। সর্ব্বদা মিষ্ট কথায় তাহাকে তুষ্ট রাখিতে ত্রুটী করিও না। যাহাতে তাঁহার মনে কষ্ট হবে এমন কার্য্য করিও না বা তদ্রূপ কথা জিহ্বাগ্রে আনিও না। খোদা রসুলের আদেশ উপদেশ পালনের পর তাহার আদেশ উপদেশ উপদেশ পালন করিও। কোন মতেই তাহার অবাধ্য হইও না। এই কার্য্য ক'টী করিতে পারিলেই তাহার 'হক' আদায় করিতে পারিবে এবং ইহা তোমার পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

যু।—আমি ওসব গোলমেলে কথা বুঝিতে পারিলাম না তুমি একটী একটী করে বলে যাও আর আমি তাহা বুঝে লই।

বা।—বেশ তাহাই হউক ;—তুমি বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক চাহিও না।

যু।—যদি চাহি ?

বা।—তাহা হইলে কিয়ামতের দিন তোমার মুখে হাড় ব্যতীত মাংস থাকিবে না এবং খোদার হুকুমে তোমার জিহ্বা পশ্চাদ্দিকে বাহির করিয়া তাহা দ্বারা তোমাকে দোজখে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে যদিও তুমি জীবনে সমস্ত দিন রোজা রাখ ও সকল রাত্রিতেই দাঁড়াইয়া এবাদত কর।

যু।—তার পর ?

বা।—স্বামীর অসম্মতিতে এক রাত্রির জন্যও তাহার শয়ন শয্যা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র নিশাযাপন করিও না।

যু।—যদি করি ?

বা।—তাহা হইলে দোজখের সর্ব্বনিম্ন স্তরে স্থান পাইবে—যদিও তুমি অদ্বিতীয় পুণ্যবতী হও।

যু।—তার পর ?

বা।—স্বামীর বিনা অনুমতিতে তাহার গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোথাও যাইও না।

যু।—যদি যাই ?

বা।—তাহা হইলে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু এমন কি পানির মাছ পর্য্যন্ত তোমাকে শাপ দিবে ;

যু।—পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ীও না ?

বা।—পাড়া বেড়াটা আমাদের স্ত্রীদের কম শয়তানী নহে।

যু।—তার পর ?

বা।—স্বামী ডাকিবা মাত্রই তাহার নিকট হাজির হইবে।

যু।—যদি ওজর করি অথবা না যাই।

বা।—তাহা হইলে তুমি বিবি মরিয়মের ন্যায় পুণ্যশীলা হইলেও তোমার জন্য দোজখের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।

যু।—যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে ?

বা।—শরিয়তের কারণ ব্যতীত অন্য কারণ অগ্রাহ্য।

যু।—তারপর ?

বা।—যদি স্বামী তোমার কোন প্রকার ধনসম্পত্তি খরচ বা নষ্ট করিয়া ফেলে তাহাতে স্বামীকে কোন কথা বলিবার অধিকার তোমার নাই।

যু।—কড়া হুকুম।

বা।—হুকুম মানুষের নয়—শরিয়তের।

যু।—আচ্ছা যদি কিছু বলিয়াই ফেলে—বা ফেলি ?

বা।—চল্লিশ বৎসরের সঞ্চিত নেকী নষ্ট হইবে।

যু।—তার পর ?

বা।—স্বামী যে প্রকার ভরণপোষণ যোগাইতে পারে তাহাতেই রাজী থাকিতে হইবে—কোন মতেই অযোগ্য জ্ঞানে ঘৃণা বা নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারিবে না।

যু।—যদি করি বা করে ?

বা।—তুমি যদি পতিদত্ত অল্পোধিক ভরণপোষণে রাজী না থাক তাহা হইলে কিয়ামতের খোদাতায়ালাও তোমাকৃত অত্ত অথবা অধিক নেকীতে রাজী হইয়া তোমাকে মুক্তিপ্রদান করিবেন না।

যু।—তারপর ?

বা।—স্বামীর সংসারের কোন বস্তু নষ্ট বা চুরি করিতে পারিবে না।

যু।—যদি করি ?

বা।—তাহা হইলে ৭০ হাজার ফেরেস্তা তোমার অমঙ্গল কামনা করিবে।

যু।—ভুল চুকে করিলে?

বা।—ভুল চুক স্বতন্ত্র। তাহার নিমিত্ত স্বামীর নিকট ক্ষমা লইতে হইবে।

যু।—তারপর?

বা।—স্বামীর বাটীতে কোন অতিথি আসিয়া আশ্রয় লইলে সন্তোষ-চিত্তে তাহার খাতির করিতে হইবে।

যু।—যদি না করি—অথবা মুখ ভারী করিয়া থাকি?

বা।—তাহা হইলে খোদার সৃষ্টি জীবমাত্রই তোমাকে অভিশাপ দিবে।

যু।—তারপর?

বা।—যাহাতে স্বামীর ক্রোধ জন্মিতে পারে এমন কায কোন মতেই করিতে পারিবে না।

যু।—যদি সেরূপ কিছু করিয়া ফেলি?

বা।—খোদাতায়ালাও তোমার প্রতি ক্রোধ করিবেন।

যু।—তারপর?

বা।—স্বামী ডাকিবামাত্রই তাহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে।

যু।—যদি সে সময় হাতে কোন জরুরি কায থাকে?

বা।—জরুরি কায অপেক্ষাও স্বামীর ডাক জোরাল।

যু।—তার পর?

বা। স্বামীর আইউব নবির ন্যায় পীড়া হইলেও বিবি রহিমার মত তাহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরক্ত হইতে পারিবে না—বা কোনপ্রকার ঘৃণাও করিবে না।

যু।—যদি মনে মনেও এক আধটুকু করা যায়?

বা।—দোজখে যাইতে হইবে। স্বামীর 'হক' অসীম। যদি কারু স্বামীর শরীরের কোন স্থান হইতে অনবরত রক্তপুঁজ বহিতে থাকে আর

সেই স্থকপালী কণামাত্রও ঘৃণা না করিয়া সে সকল রক্তপুঞ্জ জিহ্বাদ্বারা চাটিয়া পরিষ্কার করিতে থাকে—তবুও স্বামীর 'হক' আদায় করিতে সক্ষম হইবে না।

যু।—সর্ব্বনাশ! উপায়?

বা।—হাতে ধরিয়া পায়ে পড়িয়া রাজী করা।

যু।—তার পর—?

বা।—ধর্ম্মবিধানে আল্লা ব্যতীত অন্য কাহাকে সিজদা করিতে হইলে স্বামীকে সিজদা করিতে হইত।

যু।—হিন্দুরা যে গুরুজনকে সিজদা করে।

বা।—তাহাদের ধর্ম্মে থাকিতে পারে; কিন্তু আমাদের ধর্ম্মে তাহা মহাপাপ।

যু।—তার পর?

বা।—কেবল তার পর তার পর নয় "স্বামীকে সিজদা করিতে হইত" ইহাতে কি বুঝিলে?

যু।—স্বামীসেবার গুরুত্ব।

বা।—বেশ। আজিকার মত যাও—আর এক দিন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

কালের কুটিল মতি বুঝা বড়ই কঠিন! কালচক্র কখন যে কোন দিকে ঘুরে তাহা নির্ণয় করা মানবের অসাধ্য। জহুরউদ্দিনের বাটীতে আনন্দের বাজার বসিয়াছে—তাহার অনেক দিবসের এবং অনেক যত্নের আশালতা বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ফলবতী হইতে আর বিলম্ব নাই দেখিয়া তাহার হৃদয়েও হর্ষ-হাট বসিয়াছে। এই হাটে তিনি ভাবী সুখ শান্তির কত সামগ্রীই না ক্রয় করিতেছেন। তাহার আন্তরিকভাব বাহিরে ফুটিয়া মুখখানা দিব্য সুশ্রী ধারণ করিয়াছে; কিন্তু নিরানন্দের কষাঘাতে তাহার এই আনন্দ যে অচিরাৎ বিলীন হইয়া যাইবে তাহা তিনি স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই।

জহুরুদ্দীনের নিকাহের নির্দ্ধারিত দিবসের কএক দিবস পূর্ব্বে এক দিন তাঁহারা দুই ভ্রাতা নিকাহের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া বাটী আনিলেন। সে সকল দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের কতিপয় আত্মীয়া রমণী সমাগত হইল। কেহ গহণাগুলি হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া নির্ম্মাণের পরিপাট্য—গড়নের ভুল-ভ্রান্তি কোন খানা কিরূপ ওজন সহি ইত্যাদি দেখিতে লাগিল। কেহ কেহ কাপড়গুলি হাতে লইয়া কোন খানার কিরূপ পাড় কোনখানা কিরূপ বাহারের ইত্যাদি দেখিতে লাগিল এবং সে সকলের দোষ গুণ সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইয়া মীমাংসাও হইতে লাগিল। আর কতক রমণী স্ব স্ব বিদ্যবিত্তা প্রকাশ করনার্থে অপরিচিতার ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া সে সকল দেখিতে

লাগিল। বাটীর বৌ, ঝিরাও এ সুযোগ ছাড়িল না—আড়ে ওড়ে থাকিয়া অর্দ্ধহাতে পরিমাণ লম্বা ঘোম্‌টার মধ্য হইতে এক একটি বড় বড় চক্ষু বাহির করিয়া বঙ্কিম নয়নে সে সকলের প্রতি দৃষ্টি পাত করিতে লাগিল। শামসুদ্দিনের গৃহলক্ষ্মীও দূরে দূরে থাকিয়া দুই একবার দেখিল—যেমন দর্শন অমনই সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা। সে তখন হইতেই আছড়াইয়া আছড়াইয়া পা দু'খানি ফেলিতে লাগিল। ভোঃ! ইর্ষাদেবি!

নৈশাশন শেষ করিয়া শামসুদ্দিন স্বীয় শয়নগৃহে আসিবা মাত্রই তাহার স্ত্রী পদাহত ব্যাঘ্রীর ন্যায় সক্রোধে তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার মুখে যাহা আসিল তাহাদ্বারাই স্বামী বেচারাকে ন'কড়া ছ'কড়া করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিল। শামসুদ্দীন অপরাধী মানুষের ন্যায় গালে হাত দিয়া নীরবে সকলই শুনিলেন,—সহিলেন। স্ত্রীর একটি কথারও প্রতিবাদ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। শেষে তিনি স্ত্রী মহাশয়ার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। স্ত্রী মহাশয়া আরো পাঁচ কথা শুনাইয়া অবশেষে সম্মত হইলেন।

অতঃপর সন্ধির বিষয় উঠিল; কিন্তু স্বামীপক্ষের কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য হইল না। সন্ধির শর্ত্ত হইল;—শামসুদ্দিন অতগুলি কাপড় ও অলঙ্কার দিয়া জহরুদ্দীনের নিকা দিতে পারিবে না। পৃথক না হইয়া এক মুঠা অন্ন গলাধঃকরণ করিবার অধিকার তাহার থাকিল। সকালে শয়নশয্যা ত্যাগ করিয়াই লোক ডাকিয়া পৃথক হইবেন। এই সন্ধি ভঙ্গ হইলে স্ত্রী মহাশয়া তাহার বাটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

এই মর্ম্মে সন্ধির খসড়া স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। অতঃপর স্বামী, স্ত্রী চিন্তা কণ্টকিত শয্যায় দেহ ভার রক্ষা করিয়া নিদ্রা দেবীকে আহ্বান করিতে লাগিল।

পর দিবস সকালে উঠিয়া ফজরের নামাজ পাঠান্তে জহরুদ্দীন তাহার

বৈঠকঘরে বসিয়া—কোথায় কোথায় নিমন্ত্রণ দিতে হইবে, কোথাকার ক'জন কুটুম্ব আসিবে, কোথায় গাড়ী, কোথায় নৌকা পাঠাইতে হইবে এই সকল বিষয়ের তালিকা করিতেছেন; কিন্তু শামসুদ্দীন সকাল হইতেই স্ব কার্য্য সাধনে বাহির হইয়াছেন।

বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ দুই এক জন করিয়া অসিয়া জহুরু উদ্দিনের বৈঠকঘর পূর্ণ হইতে লাগিল। কি জন্য লোক ডাকা হইতেছে ইহা জানিবার নিমিত্ত গ্রামের ছোট বড় আরও পাঁচজন আসিয়া জুটিল। এমন আনন্দের দিনে লোক ডাকা কেন—এই কথা লইয়া অনেকে কানাকানি করিতে লাগিল।

লোক ডাকা শেষ হইলে সভাস্থ জনৈক মাতব্বর লোক শামসুদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—কি আপনি মানুষ ডাকিলেন কেন?

শা।—একটা কথার জন্য।

লোক।—কি কথা প্রকাশ করিয়া বলুন।

শা।—আপনাদেরকে এই জন্য কষ্ট দিলাম—আমি আর এক অন্নে থাকিব না—আপনারা পাঁচজন আসিয়াছেন আমরা যাহা পাই তাহা দিয়া পৃথক করিয়া দিন।

একি—বিনা মেঘে অশনিপাত! জহুরুদ্দীন মজলীসেই উপস্থিত ছিলেন। সহসা পৃথক হইবার কথা শ্রবণে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। হুতাশনল মনের সকল আশা ভরসা ক্ষণ তরে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অভিমানে, অপমানে তাহার মুখশ্রী একেবারেই মলিন ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দুই গণ্ডে হস্তদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণও ক্ষণতরে গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। অনেকে অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন;

কিন্তু হঠাৎ এরূপভাবে পৃথক হইবার কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

যে লোকটি শামসুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলিতে ছিলেন, তিনি একটু নীরব থাকিবার পর বলিলেন, কাল পরে পরশু আপনার ভাইয়ের নিকা আর হঠাৎ আজি এরূপ ভাবে পৃথক হইবার প্রস্তাব করিলেন ইহার কারণত আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

শা।—কারণ কি হইবে—ইচ্ছা।

লোক।—তা ত ঠিকই ; কিন্তু ইচ্ছারও ত সময় আছে।

শা—তা যাহাই হোক কিন্তু আজকেই পৃথক হব আপনারা আসিয়াছেন আমরা যে যাহা পাই মেহের্ব্বানি করিয়া অংশ করিয়া দিন। আমি তার নিকা দিয়া ফকির হইতে পারিব না।

এইবার পৃথক হইবার মূল কারণ সকলেই অবগত হইলেন। অতঃপর নিকাহ না হওয়া অবধি একান্নে থাকিবার নিমিত্ত শামসুদ্দীনকে অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

সালিস মণ্ডলী সেদিবস তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। কএকজন প্রাইভেটে যাইয়া স্থির করিলেন, এখনও ৫।৬ দিন সময় আছে এই সময়টুকুর মধ্যে শামসুদ্দীনকে বুঝাইয়া বিবাদ মিটাইয়া সঙ্গে রাখিতে হইবে। তাহা না করিলে তাহার ত দুর্ণাম হইবেই পরন্তু গ্রামেরও অপযশ হইবে। এই যুক্তি স্থির করিয়া সালীসের লোক এক একজন একেক বাহানা করিয়া উঠিয়া যাইতে লাগিলেন। শামসুদ্দীন অনেক অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—পাড়াগ্রামের শালিস, ভাঙ্গিয়া গেল। জহুরুদ্দীন মলিন মুখে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। শামসুদ্দীনের মুখ খানা মসিময় হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাগুপ্ত ঘটনার পর দিবস আবদুল মতিন সকাল বেলা তাহার মাতুলালয়ের বহির্ব্বাটীতে বসিয়াছিলেন, এই সময় জনৈক পিয়াদা আসিয়া ছালাম জানাইয়া দাঁড়াইল। পিয়াদা পশ্চিম দেশীয়, গায়ে আঙ্গ রাখা, মাথায় অর্দ্ধথান কাপড়ের পাগড়ী, স্কন্ধদেশে পাঁচ ছয় হাত পরিমাণ এক থানা বাঁশের লাঠি, পিঠোপরি একটী ঝোলা লম্বায় মান, গোঁপ জোড়াও ৫।৬ ইঞ্চির কম নয়।

পিয়াদাকে দর্শন মাত্রই আবদুল মতিন বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করিলেন; "কিয়া সিংহ-জী, থবর কিয়া?" পিয়াদা "এ-গো চিঠি বা" বলিয়া ঝোলা হইতে এক থানা পত্র বাহির করিয়া বিশ্বাসজির হস্তে প্রদান করিয়া বলিল;—"হাম দোছরা কামমে যাতা হায় আপ আজহি বাবুছে ভেট কিজিয়েগা।" বলিয়া চলিয়া গেল।

পিয়াদা চলিয়া যাইবার পর তিনি পত্র থানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেথাছিল;—"ইতোপূর্ব্বে আপনার নিকট বহুবার তাগাদা পাঠাইয়াছি; কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। আপনি কারবার বন্দ করিয়া দিয়াছেন বিধায় আমি আর টাকা রাথিতে পারি না, অতএব সপ্তাহকাল মধ্যে আমার পাওনা পাঁচ সহস্র টাকা মায় সুদ সহ পরিশোধ না করিলে আমি অগত্যা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইব। ইতি—।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আবদুল মতিন বিশ্বাসের মরহুম পিতা আমির

আলি বিশ্বাস ইংরাজ বাজারের জনৈক মাড়োয়ারী মহাজনের নিকট কিছু পুঁজি লইয়া কারবার করিতেন। বলা বাহুল্য সেই টাকারই এই জরুরি তাগাদা।

পত্র পাঠে আবদুল মতিন বিশ্বাস ক্ষণতরে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। যম ও মহাজন এই দুই নামে কাহার না মুখ শুকায়? বিধায় তাহার মুখ খানা একটু মলিন হইয়া উঠিল। এই সময় তাহার মাতুল সাহেব সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার মুখভাব দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি পত্র খানা দেখাইলেন। পত্র খানা পাঠ করিয়া তাহার মাতুল সাহেবও মহাচিন্তিত হইলেন এবং বলিলেন; "কি সর্ব্বনাশ, এমন শুভ নিকার দিনে এরূপ কড়া তাকাদা।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ বাটীময় প্রকাশ হইয়া পড়িল। আবদুল মতিন বিশ্বাসের জননী অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। বাটীর সকলেই নিরাশ সাগরে ডুবিল। নিকাহ হর্ষোচ্ছ্বাসিত বাটী খানা কিছু কালের জন্য একেবারেই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আর যে বালিকাটীর শুভ নিকাহের দিনে এই ঘটনা ঘটিল তাহার কথা লিখিতে পারা যায় না—মনে মনে কল্পনা করিয়া লইতে হয়।

পত্রের সংবাদ ক্রমে গ্রামময় প্রকাশ হইয়া পড়িল। শত্রুগণ আনন্দে হাত তালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; মিত্রগণ বিষাদ গণিতে লাগিলেন। আবদুল মতিন বিশ্বাস চিন্তা সাগরে ডুবিলেন।

আবদুল মতিন বুদ্ধিমান যুবা—তাহার চিন্তা শক্তি যথেষ্ট। এই বর্ত্তমান বিপদে তিনি অধীর বা বিচলিত হইলেন না। অনেক চিন্তার পর কি যেন স্থির করিয়া—সেই দিন বৈকাল বেলা ইংরাজ বাজার রওয়ানা হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইদানীন্তন কালের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া দর্শনে জগৎ স্তম্ভিত। মানুষ বিজ্ঞান বলে অনেক দুসাধ্য কার্য্য সহজ সাধ্য করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু চন্দ্র, সূর্য্যের গতি,—নদ, নদীর গতি—ও সময়ের গতি রোধ করিতে কাহারও সাধ্য নাই—হইবেও না। ইহারা অপ্রতিহত গতিতে স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আসিতেছে এবং করিতে থাকিবে। তুমি বুক ভরা দুঃখে হৃদয়পূর্ণ অশান্তিতে ছট ফট কর অথবা হৃদয় পূর্ণ সুখ শান্তিতে কালাতিপাত কর ইহারা তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া আপন আপন গতিতে আপন আপন ক্রিয়া সম্পাদন করিবেই করিবে।

জহুরুদ্দীন ও শামসুদ্দিনের সেরূপ অবস্থার মধ্যদিয়া সাবিতাদেব স্বকীয় পালা সমাপ্ত করিয়াছেন। অদ্য সমস্ত দিন ধরিয়া উভয় ভ্রাতৃ-যুগলের মধ্যে কেহই পানীয়জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই। তাঁহারা দুই ভ্রাতা একই বাটীতে থাকিয়াও যেন, আজি কত যুগযুগান্তরের পথে অবস্থান করিতেছেন। অদ্যকার জন্য যেন তাঁহাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কোনই সম্পর্ক নাই। তাঁহাদের নিকাহ আনন্দপূর্ণ বাটীতে বিষাদ ও নীরবতার প্রহরী বসিয়াছে। হায়রে হরিষে বিষাদ!

অদ্যকার দিবসটা জহুর উদ্দিনের যে অবস্থার মধ্য দিয়া অতীত হইয়াছে তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আজি তাহার হৃদয়ের আশালোকের ক্ষীণশিখাটী পর্য্যন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া নির্ব্বাপিত হইবার কথা; কিন্তু তিনি অভিমান, অপমান, আশঙ্কার সহস্র সহস্র

বৃশ্চিক দংশনজ্বালা বুকে করিয়াও স্থির করিয়াছেন;—তিনি স্বীয় আশা-লতাকে কোন মতেই ছিন্ন করিতে পারিবেন না। যে প্রকারেই হউক শামসুদ্দীনকে রাজী করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিবেন। তবে যদি শামসুদ্দিন একান্তই রাজী না হয়েন তাহা হইলে অন্য পন্থা অবলম্বণ করিতে ও পশ্চাৎপদ হইবেন না; কিন্তু মৌলবী সাহেবের যুক্তি ও পরামর্শ ভিন্ন কার্যোদ্ধারের কোন উপায় নাই।

তিনি সমস্ত দিবস ধরিয়া এই যুক্তি স্থির পূর্ব্বক সন্ধ্যায় মগরবের নামাজ পাঠ করিতে মসজিদে যাইয়া মৌলবী সাহেবের খোঁজ লইলেন; কিন্তু সে দিবস মৌলবী সাহেব স্থানান্তরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ অপ্রাপ্তে ভগ্নমনোরথ হইয়া বাটী ফিরিলেন।

সন্ধ্যার একটূ পর মৌলবী সাহেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাসায় ফিরিলেন। তিনি বাসায় উপস্থিত হইতেই রমজান আলি তাঁহার নিকট যাইয়া দিবসের আদ্যোপান্ত ঘটনার কথা বিবৃত করিয়া শুনাইল। তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক সকল কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন;—“আচ্ছা এখন বাটী যাও।” রমজান আলী চলিয়া গেল।

সে রাত্রিতে শামসুদ্দীন অনাহারেই শয়নশয্যা অধিকার পূর্ব্বক নিদ্রা-দেবীর প্রসন্নতা কামনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মনের দুর্ব্বিষহ চিন্তা দর্শনে নিদ্রাদেবী কোন মতেই তাঁহাকে নিজের সুশীতাঙ্কে স্থান দিতে সম্মতা হইলেন না। তিনি সমস্ত রাত্রি অনিদ্রাবস্থায় নানাপ্রকার দুশ্চিন্তা করিয়া শেষরাত্রিতে তন্দ্রাবস্থায় এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিলেন।

তিনি স্বপ্নে এক অপরিচিত রাজ্যে একটী নদীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নদীটী উত্তর বাহিনী খরবেগে প্রবাহিতা। নদীর পূর্ব্ব পারে সুরম্য নগর। তিনি এই নগরে প্রবেশেচ্ছায় খেয়াঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু তিনি উপস্থিত হইবার একটু পূর্ব্বে

এক খানা নৌকা বুক ভরা যাত্রী লইয়া কূল ত্যাগ পূর্ব্বক কিছু দূর চলিয়া গিয়াছিল। তিনি নৌকাখানা ফিরাইবার নিমিত্ত অনেক ডাকা-ডাকি, অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। " তিনি হতাশচিত্তে যেমন পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়া-ছেন অমনি দেখিতে পাইলেন একটী বিশালকায় শার্দ্দূল বড় বড় রক্তিম চক্ষু চড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণেচ্ছায় ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শার্দ্দূলটী এক লম্ফে তাহার ঘাড়ে চাপিয়া সজোরে এক চপেটাঘাত করিল। তিনি "বাঘ বাঘ" বলিতে বলিতে অধঃবদনে ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

তিনি একটু পর চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, জহুরুদ্দীন তাহার মস্তক স্বীয় জানু উপরি রক্ষা করিয়া বাতাস করিতেছেন এবং একটী অপরিচিতা বালিকা—একখানা লগুড় হস্তে করিয়া শার্দ্দূলটীকে বহু দূর তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।

এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই তাঁহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; তিনি বিকট চীৎকার পূর্ব্বক উঠিয়া বসিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। এই চীৎকারে তাঁহার স্ত্রীরও নিদ্রা ছুটিয়া গেল সে বলিল; "তুমি রাত্রে অমন চেঁচা চেঁচি করিতেছ কেন?" শামসুদ্দীন কাঁপিতে কাঁপিতেই বলিলেন, প্রদীপ প্রদীপ।" তাঁহার স্ত্রী শশব্যস্তে প্রদীপ ধরাইয়া দেখিলেন—তাঁহার স্বামী বসিয়া 'ঠক্ ঠক্' করিয়া কাঁপিতেছেন এবং ঘর্ম্ম ধারায় তাঁহার আপাদ মস্তক ভাসিয়া যাইতেছে। স্বামীর এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাহার আত্মা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, সে স্বামীর গায়ের ঘাম মুছাইতে মুছাইতে আবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তাহার স্বামী এবারও কোন উত্তর না দিয়া কেবল মাত্র বলিলেন;—"এখন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" স্ত্রী সজল নেত্রে পতির মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

তাহাদের স্বামী স্ত্রীর এই অবস্থা দেখিতে দেখিতে বিষময় যামিনী নিজ পালা শেষ করিল। একটু বেলা হইলে শামসুদ্দীন যাইয়া মৌলবী সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; কিন্তু সাক্ষাৎ মাত্রই তাঁহার দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইল। সহসা তাঁহার স্বভাবের এতাদৃশ ভাবান্তর দর্শনে মৌলবী সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শামসুদ্দীন কোন কথা গোপন না করিয়া সকল কথাই খুলিয়া বলিয়া স্বপ্নের তাৎপর্য্য বুঝিবার নিমিত্ত বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মৌলবী সাহেব একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন;—স্বপ্নের ফল মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হয় না;—এ স্বপ্নের ফল স্বপ্নের অণুকরণেই ফলিবার সম্ভব। তবে স্বপ্নের শার্দ্দূল দেখিলেই পুলিশের রাঙ্গা-মূর্ত্তির দর্শন ঘটিয়া থাকে—ইহা এক প্রকার পরীক্ষিত। সে যাহা হউক খোদা মালিক আছেন আপনি কিছু সাদকা করিবেন।

অতঃপর তিনি আরও পাঁচদিক হইতে পাঁচ কথা বলিয়া শামসুদ্দীনকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া জহুরুদ্দীনের নিকাহের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। নিকাহের কথা শ্রবণ মাত্রই শামসুদ্দিনের মুখ খানা গম্ভীর হইয়া উঠিল, তিনি ক্ষণকালের জন্য নীরব হইলেন। এই নীরবতার ফলে তাঁহার নয়নদ্বয় ছল ছল হইয়া উঠিল,—তিনি বলিলেন;—"জনাব! তার নিকা দিতে আমার ততটা অমত নাই বরং আমার মনে—হইতেছে কোন মতে তার নিকাটা দিয়া ফেলি; কিন্তু কি করিব কোন মতেই পারিতেছি না—বাড়ীতে কোন মতেই বুঝে না। জনাব! আমার মনে হইতেছে বোধ হয় তাহার শুভ কাযে বাধা দিতে যাইয়াই আমি ওরূপ ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়াছি। কপালে যে কি আছে বলিতে পারি না—খোদা আমাকে—।" আবার তাঁহার নয়নদ্বয় সজল হইয়া উঠিল।

মৌ।—বাটীতে কে বুঝে না—বোধ হয় আপনার স্ত্রী ?

শা।—জি।

মৌঃ।—সে কি আপত্তি করে ?

শা।—স্ত্রীলোকের অনেক কথা—সে সকল শুনিয়া কি করিবেন, তবে শেষ কথা অতগুলি গহণা ও কাপড় দেওয়াতেই গোল বাধিয়াছে।

মৌ।—আপনি তার কথার প্রতিবাদ করেন না ?

শা।—কতক করিয়াছি; কিন্তু কোন মতেই বুঝে না।

মৌঃ।—সেখানে যে সকল কাপড় ও অলঙ্কার ইত্যাদির কথা স্বীকার করিয়া আসাগিয়াছে তাহাত আর কমাইবার উপায় নাই, এখন আপনার বিবি সাহেবাকে কোন মতে বুঝাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে—আপনি তাহা পারিবেন কি ?

শা।—তাহাকে সে বিষয় কোন কথা বলিতে আমার বড় ভয় হয়। সে অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক অল্প কথাতেই চটিয়া আমাকেই দু'কথা শুনাইয়া দেয়।

মৌঃ।—ছিঃ! ওরূপ কথা বলিতে নাই। আপনি যান তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলুন-গে। যখন তিনি গহণার জন্যই আড়িয়াছেন তখন যে পরিমাণ স্বর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই পরিমাণ তাঁহাকেও দেওয়া হইবে আর অন্য কিছুই দেওয়া হইবে না, ইহাতে তিনি কি বলেন।

আর ইহাও মনে রাখিবেন পৃথক হইলেই যে আপনি ধনবান এবং আপনার ভ্রাতা ফকির হইবেন তাহাও নহে। জানেন ত সকলের মূল "তকদির"।আর আপনি পৃথক হইলেই যে তিনি নিকাহ্ করিতে পারিবেন না তাহাও নহে সকলের উপরই একজন মালিক আছেন। আপনি এখন

এমন চতুর মানুষ হইয়াও যে, স্ত্রীর কথা কাণে করিয়া সোণার সংসার ছারখার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ইহা বড়ই পরিতাপের কথা। আরও দেখুন ভাইয়ে ভাইয়ে যা'য়ে যা'য়ে কলহই আমাদের গৃহস্থের অনেকটা অধঃপাতের কারণ। যান, বংশমর্য্যাদার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিবেন।

শামসউদ্দিন আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেলেন ; কিন্তু সেবেলা আর ফিরিলেন না। বৈকালবেলা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন ; তাহাকে অনেক বুঝাইয়া রাজী করিয়াছি সে সেই অনুপাতে অলঙ্কার পাইলে আপাততঃ আর পৃথক হইবে না।

মৌ। তাহারা অলঙ্কারের দাবী বেশ তাহাই দেওয়া হইবে। আর কোন কথা নাই ত ?

শা।—জি না।

মৌ।—আপনি তাহাকে নিজেই রাজি করিয়াছেন না কোন লোকদ্বারা ?

শা।—জিনা আমি পারি নাই ইউসুফ ভাই তাহাকে অনেক বুঝাইয়া রাজি করিয়াছেন।

মৌলবী সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ;—যাক এখন আপনারা মনের কালি দূর করিয়া সরল মনে মিলিয়া যান। স্ত্রীর কথা শুনিয়া আর সোণার সংসার শ্মসানে পরিণত করিবেন না।

এই বলিয়া তখনই জহুরউদ্দিনকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মৌলবী সাহেবের ডাক শুনিয়া জহুরুদ্দিন তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিতেই মৌলবী সাহেব বলিলেন ;—আপনাদের সকল বিবাদ মিটিয়া গেল আপনারা স্ব স্ব মনের কালি দূর করিয়া সরল অন্তঃকরণে মিলিয়া যান।

বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই জহুরউদ্দিন অগ্রজের হস্তধারণপূর্ব্বক সজল নয়নে বলিলেন ; "আমায় ক্ষমা করুণ।" অনুজের কাতরবাক্যেও চক্ষের জল দর্শনে শামসউদ্দিনের হৃদয় গলিয়া গেল—তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না আবেগভরে অনুজের গলা ধরিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অহো! কি সমবায় !!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিধির নিয়োজিত কার্য্যে বাধা দিতে কাহারও সাধ্য নাই। আবদুল মতিন বিশ্বাস ত্রিশ বিঘা আম্র-বাগান তিন বৎসরের জন্য 'কটে' দিয়া মাড়োয়ারীর সঙ্গে মিটমাট করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার বাটীতে আবার নিকাহের ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

আহা! আজি কি সুখের দিন! প্রিয় পাঠক পাঠিকা! অদ্যই সেই চতুর্থ রমজান তেইশা শ্রাবণ শুক্রবার জহুরুদ্দিনের নিকাহের নির্দ্ধারিত শুভদিন। সেহেরি খানা (১) খাইয়াই কামডোল গ্রামে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসী অনেকেই বরযাত্রী যাইবার নিমিত্ত নিজ নিজ সাজ সজ্জা করিতেছেন। জহুরউদ্দিনের বাটীতে মহানন্দ কোলাহল। তাঁহার চাকর বাকর এবং আত্মীয় স্বজনগণ এখান সেখান আনা লওয়া বাঁধা ছাঁদা করিতেছেন। অন্তঃপুরে পুরবাসিনিগণ গহণার ঝনৎকার দিয়া, আঁচল দোলাইয়া কে কোন কায করিতেছে তাহার কোনই শৃঙ্খলা নাই।

ক্রমে বিভাবরী অবসান হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে নীলাকাশের অলঙ্কার তারকা রাজি একএকটী করিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পক্ষিগণ বৃক্ষডালে বসিয়া পরমপাতার গুণগান করিতে আরম্ভ করিল। তৎপর দেখিত দেখিতে পূর্ব্বাকাশ ঈষৎ পরিষ্কার হইয়া নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং ঊষার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া লহিতারুণ ধীরে ধীরে সহাস্যে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তাহার কণক হাসিতে যোগদান করিয়া কামডোল গ্রাম হাস্য মূর্ত্তি ধারণ করিল।

(১) রমজান মাসে ঊষোদয়ের পূর্ব্বে যে আহার করা হয়।

এই সময় গ্রামের বালকবালিকাগণ জহুরুউদ্দিনকে 'দুলাহ' সাজে দেখিবার নিমিত্ত বিলের ঘাটে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। জহুরউদ্দিন দুলাহ সাজে সাজিয়া বরযাত্রিগণ সমভিব্যাহারে বিলের ঘাটে যাইয়া নৌকায় উঠিলেন, বালকবালিকাগণ চরিতার্থ হইল। অতঃপর দাঁড়ী-মাঝীগণ নৌকার নঙ্গর তুলিয়া আনন্দপ্লুত-হৃদয়ে নৌকা চালনা করিতে লাগিল; নৌকাখানা বিলের বিশাল বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া কলকল নাদে ছুটিয়া চলিল।

পুকুরিয়া বাজারের পাদদেশ বিধৌতঃ করিয়া যে ক্ষীণ কায়াস্রোত-স্বতিটী ভুজঙ্গগতিতে প্রবাহিত হইতেছে, নৌকাখানা কামডোল বিল অতিক্রম করিয়া সেই নদীপথে পূর্ব্ব মুখে ছুটিয়া চলিল এবং নদীটী পির-গঞ্জের নিম্নে যে স্থানে মহানন্দার কোলে গা ঢালিয়া দিয়াছে—বেলা দশ ঘটিকার সময় সেই সঙ্গমস্থলে যাইয়া পৌছিল। শ্রাবণ মাসের পূর্ণ যৌবনা মহানন্দা দুইকুল প্লাবিত করিয়া ফেণারাশি বক্ষে ধারণপূর্ব্বক হেলিয়া দুলিয়া মহাকল্লোলে থৈ থৈ করিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। নৌকাখানা সেই খর প্রবাহে গা ঢালিয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিল এবং অপরাহ্ন বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় নিমাসরায়ের ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইল।

পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী ঘাটে গোগাড়ী সমূহ অপেক্ষা করিতে ছিল। নৌকাখানা ঘাটে লাগিতেই দুলাহ্ মিঞা সদলে অবতরণপূর্ব্বক গো যানে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীপুর পৌছিলেন।

পাত্রীপক্ষ পাত্র এবং পাত্রপক্ষগণকে সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। তখন মুসলমানগণের অতি আনন্দের রোজা এফ্তারের (ভঙ্গ) সময় হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি পাত্রপক্ষকে রোজা এফ্তার করান হইল। তৎপর মগরবের নামাজ পাঠান্তে বরপক্ষকে পরিতৃপ্তির সহিত আহার করাইয়া বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করা হইল।

তৎপর অন্যান্য সকলের আহার ক্রিয়া শেষ হইতে রাত্রি প্রায় দশটা হইয়া গেল। সুতরাং এই সময়টুকু মধ্যে কোন পক্ষ হইতেই নিকাহ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন হইল না। আবদুল মতিন বিশ্বাস সকল কাজ সারিয়া রাত্রি প্রায় ১১টার সময় নিকাহের মজলিসে আসিয়া বসিলেন। মজলিসে পান, তামাক এবং বা-তা কথার গল্প-গুজব চলিতে লাগিল। এই সময় যামঘোষগণ সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করিল;—"যামিনী দ্বিযাম।"

অতঃপর প্রথমে বরপক্ষ হইতে নিকাহের কথা উত্থাপিত হইয়া দেনা পাওনা ইত্যাদি চুকাইয়া দেওয়া হইল। আবদুল মতিন বিশ্বাস কাবিন নামার জন্য খুবই চাপিয়া ধরিলেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন আপত্তি হইল না। জহুরুদ্দীন বিনা বাক্য ব্যয়ে ৪৫ বিঘা জমির কাবিন নামা লিখিয়া দিলেন। তৎপর আবদুল মতিন বিশ্বাসের মাতুল সাহেব বরপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার ইত্যাদি লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মজলিসে উকিল সাক্ষীর খোঁজ হইতে লাগিল।

অন্য আবদুল মতিন বিশ্বাসের মাতুলালয়ের অন্তঃপুরে অন্তঃপুরা-চারিগণ গিন্‌গিন্ করিতেছেন। অনেক বড় বড় ঘরের মহিলাগণ সমাগত হইয়া বাটীখানাকে গুলজার করিয়া তুলিয়াছেন। দুল্‌হীণের গহণা ও কাপড় ইত্যাদি অন্তঃপুরে আসিতেই সে সকল দেখিবার নিমিত্ত সমাগত মহিলাগণ ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। একেকজন একেকখানা হাতে লইয়া দোষ গুণ বিচার করিতে লাগিলেন। আবদুল মতিন বিশ্বাসের মাতুল সাহেব "নিকা পড়াইবার আর বিলম্ব নাই জল্‌দি দুল্‌হীণকে সাজাও" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে দুল্‌হীণের জননীর আদেশানুযায়ী কতিপয় আত্মীয়া রমণী দুল্‌হীণকে দুল্‌হীন সাজে সুসজ্জিত করিলেন। এই সময় জনৈক উকিল

দুই জন সাক্ষী সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দুল্‌হিনের সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। দুল্‌হিনের ভাবীদ্বয় ও অন্যান্য রহস্য-প্রিয়া মহিলাগণ —দুলহিনের সঙ্গে যাঁহাদের রহস্য চলে তাহারা কেহ কেহ মুখে আঁচল চাপিয়া, কেহ কেহ মৃদুকণ্ঠে ফুস-ফাস করিয়া এবং মুখরাগণ উচ্চকণ্ঠেই দুলহিন বেচারির প্রতি রহস্য-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ বলিল;—ওরে ভাই ঢাকে ঢোলে বিয়ে জয়কার দিতে মানা—সে কি কথা—জলদি কবুল করে ফেল। কেহ বলিল;—প্রাণটা কোন খানে রেখে চুপটি করে আছ ভাই—ধাঁ করে 'হুঁ' করে বসঁ। কেহ বলিল;— অমন রাঙ্গা টুকটুকে দুলা পাইলে পুছিবার আগেই আমি কবুল করে বসি—ধন্য যে তুমি চুপ করে আছ। কেহ বলিল;—ওরে ভাই সবার বুঝে সবায় করে করিতেও হয়—অনেকক্ষণ হল—'হুঁ' কর। তন্মধ্যে আর একটী মুখরা রমণী হাসিতে হাসিতে বলিল;—আরে ভাই তোমরা বুঝবে কি—কলা খেতে কি গলা ব্যথা করে,—তবে ঐযে পোড়া 'সরম'— তোমরা দেখ না এখনই কবুল করে বসছে। তাহার এই কথা শুনিয়া আর একটি রমণী বলিল;—কবুল যদি করতেই হবে তবে আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? এই প্রকার নানাজনের নানারূপ রহস্য বাক্যে দুলহিন বেচারি একেবারেই অধঃবদন হইয়া পড়িল।

তাহার মুখের অর্দ্ধহাত পরিমাণ ঘোমটা ক্রমান্বয় ঝুলিয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিবার উপক্রম হইল।

দুলহীনের মাতামহী এসকল দেখিয়া নাতিনীকে বলিলেন;—বুবু আর দেরী করিস না—মানুষগুলা অনেকক্ষণ থেকে বাহিরে খাড়া হয়ে আছে। দুলহিন বেচারি অগত্যা অবশেষে লজ্জা-বিজড়িতকণ্ঠে অথচ অতি

মৃদুস্বরে—সম্মতি জ্ঞাপন করিল। উকিল সাহেব বার বার তিনবার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সাক্ষীদ্বয় সহ বাহির হইয়া গেলেন।

অতঃপর পাত্র-পাত্রীর সম্মতিক্রমে শুভ পরিণয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

পর দিবস জহুরুদ্দীন সস্ত্রীক বাটি ফিরিতে উদ্যত হইলেন। বর-যাত্রিগণের মধ্যে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। সকলের মুখেই ফুল্ল-ভাব; কিন্তু পাত্রীপক্ষগণের মুখে ক্ষণেকের নিমিত্ত মলিনতা ফুটিয়া উঠিল। নব-বধূ তাহার মাতামহীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। মাতামহীও নয়ননীর থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না। দুলহীনের জননী এবং ভাবীদ্বয় ও অন্যান্য আত্মীয়াদের চক্ষেও অশ্রু সঞ্চার হইল।

অতঃপর মাতামহী দৌহিত্রীকে অনেক হিতোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পাল্কীতে তুলিয়া দিলেন। আবদুল মতিন বিশ্বাসের মাতুলালয় ক্ষণতরে বিষাদ তিমিরে ডুবিয়া গেল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যুবতী।—আজি ভাই কয়েকদিন হইতে একটা কথা বলিব বলিব বলিয়া মনে করিতেছি; কিন্তু বলিতে সাহস পাই না।

বা।—কেন—সাহস হারাইলে কবে থেকে?

যু।—তোমার দিকে দেখিয়া—তুমি ভাই এখন একরকম নূতন মানুষ হইয়াছ—জানি না তোমার মনের গতি কিরূপ আছে।

বা।—(ঈষদ্ধাস্যে) মেহের্ব্বানী বেশ! আচ্ছা আমি সাহস দিলাম।

যু।—এবার তুমি ওখানে থাকার সময় আমরা একটা কথা লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম; কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় নাই এবং আমাদের দ্বারা তাহার মীমাংসা হইবারও নহে। এমন কি তাঁহাকে (স্বামী) বলিয়াও সে কথার সন্তোষজনক উত্তর পাই নাই।

বা।—কথাটা কি?

যু।—কথাটা এই যে,—আমাদের প্রতি যে পাঁচ অক্তের নামাজ পড়া ফরজ্ হইয়াছে তাহা যে যে সময় পড়িবার হুকুম হইয়াছে সে সকল সময় ভিন্ন অন্য কোন সময় হয় নাই কেন এবং যদি হইয়াছে, তাহার কোন কারণ আছে কি না?

বা।—দেখ ভাই এটা তোমাদের অনধিকার চর্চ্চা করা হইয়াছে। তুমি এখন হইতে সাবধান হও। খবরদার আর কখন এরূপ কথা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিও না। এইরূপ তর্ক করাতেই মানুষ "গুমরাহ" হয়।

কেন না শরিয়তের উপর প্রশ্ন করিতে কাহারও অধিকার নাই। তুমি কি জান না শরিয়ত আল্লা, রসুলের নির্দ্দিষ্ট।

যুবতীর সুন্দর মুখ খানি একটু মলিন হইয়া উঠিল। সে বলিল;—আমি তোবা করিতেছি এমন কথা আর কখন মুখে আনিব না—তবে যখন কথাটা হইয়া পড়িয়াছে—।

বা। আচ্ছা সে কথার উত্তর দিতেছি; কিন্তু তাহা ঠিক হইবে কিনা তাহা খোদাতায়ালাই জানেন। এক খানা কেতাবে দেখিয়াছি—হজরত আলি বলিয়াছেন;—একদা আমরা রছুলুল্লার নিকট বসিয়া ছিলাম ইতি-মধ্যে তথায় কতিপয় এহুদী আসিয়া বলিল;—হে মোহাম্মদ! আমরা আপনাকে একটা প্রশ্ন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছি; কিন্তু সে প্রশ্নটার উত্তর ফেরেস্তা মোকার্রাবিন (১) ও পয়গাম্বর (২) ভিন্ন অন্য কেহই দিতে পারে না। আপনি যদি আল্লার প্রেরিত হয়েন তাহা হইলে অবশ্যই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইবেন। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন অথবা কোন প্রকার ভুল করেন তাহা হইলে বুঝিব আপনার পয়গম্বরী দাবী মিথ্যা। এই বলিয়া তোমার কথিত প্রশ্নটী করিয়াছিল।

যু।—জনাব রসুল তাহার উত্তর দিয়াছিলেন?

বা।—হাঁ—তিনি বলিয়াছিলেন;—প্রথম আকাশের উপর একটা দায়েরা অর্থাৎ গোলাকার স্থান আছে। সেই দায়রা হইতে সূর্য্য একটু হালিয়া পড়িলেই ফেরেস্তাগণ আল্লাহতায়ালার তসবি (স্তুতি) পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং সে সময় আকাশের যাবতীয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় পরন্তু এই সময় নেক দোওয়া কবুল হয় বিধায় সময়টা বড়ই মোবারক (৩) তাই এই সময় আমাকে ও আমার উম্মত (শিষ্য) গণকে জোহরের নামাজ পড়িবার আদেশ হইয়াছে।

(১) আল্লার নিকটবর্ত্তী ফেরেস্তাগণ। (২) আল্লার প্রেরিত মহাপুরুষগণ।
(৩) আয় উন্নতি প্রযুক্ত সময়।

যে সময় 'আসরের' নামাজ পাঠ করা হয় সেই সময়ে বেহেস্তের মধ্যে শয়তান আদমকে কুচক্রে ফেলিয়া "ফল" খাওয়াইয়া ছিল এবং মানবকে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট করিবার জন্য সেই সময়টা তাহার উপযুক্ত সময়—তাই আল্লাহতায়ালা সেই সময়ে আমাদিগকে আসরের নামাজ পাঠ করিবার হুকুম করিয়াছেন; কেন না সে সময় খোদার এবাদতে নিযুক্ত থাকিলে শয়তান ফেরেব দিতে পারে না।

সূর্য্যাস্ত হইবা মাত্রই আদমের বেহেস্তকৃত গুনাহ মাফ হইয়াছিল এবং এই সময় নামাজ পড়িলে ও দোঁওয়া করিলে তাহা কবুল হয় ও গুণাহ মাফ হয় তাই এই সময় আমাদিগকে মগরবের নামাজ পাঠ করিবার আদেশ করা হইয়াছে।

যে সময় এশার নামাজ পাঠ করা হয় সেই সময় আমার পূর্ব্বের পয়গম্বরগণও নামাজ পাঠ করিতেন এবং সেটা অতি মোবারক সময়, তাই সেই সময় আমাদিগকে এশার নামাজ পড়িবার আদেশ হইয়াছে।

সূর্য্য উদয় হইবার সময় শয়তানের মাথার উপর দিয়া উদয় হয়। সেই সময় কাফেরগণ গাএর-খোদাকে (১) সিজদা করিয়া থাকে এই নিমিত্ত তাহাদের সেই সিজদা করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে ফজরের নামাজ পাঠ করিবার আদেশ করা হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত শুনিবা মাত্রই ইহুদিগণ একবাক্যে "সাদকৃতা" অর্থাৎ তুমি সত্য বলিলে বলিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেল। এই ভাই আমি যাহা জানিতাম তাহা তোমাকে শুনাইয়া দিলাম।

বু।—"শয়তানের মাথার উপর দিয়া সূর্য্য উদয় হয়" কথাটা বুঝিতে পারিলাম না।

---

(১) সূর্য্য, পাবক, দেব-দেবী ইত্যাদি।

বা।—যে সময় সূর্য্য উদয় ও অস্ত যায় সেই সময় শয়তান যাইয়া সূর্য্যের উদয় ও অস্ত স্থানে মাথা লাগাইয়া দাঁড়ায়। তাহার কারণ এই যে, সে সময় যাহারা সূর্য্যের উপাসনা করে তাহারা তৎসঙ্গে শয়তানের উপসনাও করিয়া থাকে এবং তাহাতে শয়তান নিজের প্রতি তাহাদের মন আকর্ষণ করিবার বিশেষ সুযোগ পায়। বিধায় যাহাতে শয়তান কোন মুছলমানের মনে কোন প্রকার ভক্তি ভাবের উদ্রেক করিতে না পারে বলিয়া সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত কালে নামাজ পড়া নিষেধ হইয়াছে।

যু।—"বুবু তুমি জনম জনম সুখে থাক" বলিতে বলিতে যুবতী প্রস্থান করিল।

আমরা অত্র উপাখ্যানের প্রায় আরম্ভ হইতেই পাঠক পাঠিকাগণকে এই যুবতী ও বালিকাকে দেখাইয়া আসিতেছি; কিন্তু এপর্য্যন্ত সে দু'টীর প্রকাশ্য পরিচয় দিবার অবকাশ পাই নাই। বলা বাহুল্য যুবতীটা আবদুল মতিন বিশ্বাসের প্রথমা পত্নী এবং বালিকা দুখী ভিন্ন অন্য কেহই নহে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জহুরুদ্দীনের নিকাহের পর সুখ শান্তির মধ্য দিয়া মাসাধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের পতি পত্নীতে পূর্ব্ব হইতেই প্রণয় ছিল, এখন পরিণয় ও পরিচয় হইয়াছে—আকাঙ্খাণুরূপ উভয়ের মনের খাপ খাইয়াছে—দাম্পত্য জীবনে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইতিমধ্যে হুথী একবার লক্ষ্মীপুর গিয়াছিল;—অদ্য ২৫ শে ভাদ্র দ্বিরাগমন করিয়া স্বামীর মন ও গৃহ আলো করিয়াছে।

এই ২৫শে ভাদ্র বুধবার দিবাগত রাত্রির আহার শেষ করিয়া হুথী তাহার স্বামীর শয়ন গৃহে বসিয়া পান তৈয়ারী করিতে ছিল এই সময় তাহার প্রিয়তম পতি এশার নামাজ পাঠান্তে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বালিকা স্বামীকে দর্শন মাত্র দাঁড়াইয়া সহাস্যে সম্ভাষণ করিল। তৎপর জহুরুদ্দীন শয়ন শয্যায় স্থান গ্রহণ করিলে হুথী স্বহস্তে তাহার মুখে একটা পানের খিলি তুলিয়া দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল। জহুরুদ্দীন স্নেহভরে স্ত্রীর কর-কমল ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া লক্ষ্মীপুরের নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—বলিতে কি তিনি এক যোগে প্রায় ঝুড়ি খানেক প্রশ্ন করিয়া ফেলিলেন।

হুথী স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিল;—সেখানে সবই ভাল দেখিয়া আসিলাম; কিন্তু—।

জ।—কিন্তু কি?

হু।—যে ক'দিন সেখানে থাকিয়া আসিলাম সে ক'দিন ধরিয়া এক

জনের মুখে হাসি দেখি নাই। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাম্বুল রাগ রঞ্জিত অধরৌষ্ঠ বিকম্পিত করিয়া একটু মুচকিয়া হাসিল।

অমন কথায় স্ত্রীকে হাসিতে দেখিয়া জহরুদ্দীন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;—সেটা কে? দুখী আবার সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিল;—সখা—বলিতে পারিব না।

জ।—কেন,—সে কথায় এমন কি বাধা আছে তাই বলিতে পারিবে না?

দু।—তোমার নিকট তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না।

জ।—আমার নিকট তোমার গোপন করিবার কিছু আছে কি?

দু।—(প্রেমগর্ব্বে) আছে বৈ-কি।

জ।—থাকিলেও ছাড়িব না—বলিতেই হইবে।

দু।—জোর করিয়া শুনিবে না কি?

জ।—না।

দু।—তবে আমি বলিব না।

জ।—আমিও ছাড়িব না।

দু।—তবেই ত জোর করা হইল।

জ।—না—অনুরোধ।

দু।—না আর ঝগড়া করিলে চলিবে না এখন বাধ্য হইয়া বলিতে হইল।

জ।—সে কি কথা—বাধ্য!

দু।—না স্বেচ্ছায়—প্রশ্নের উত্তরে।

জ।—বেশ,—তবে বল।

দু।—(ঈষদ্ধাস্তে) আচ্ছা শুনিতে চাও না সে লোকটীকে দেখিতে চাও?

জ।—দেখিতে পাইলে শুনিতে কে চায়।

ছ।—তবে দেখাই।—এই বলিয়া স্বামীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিজ বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া বলিল;—এই দেখ সে-জন।

জহুরুউদ্দিন আনন্দ পারাবারে ভাসিলেন। তিনি মর্ত্ত্যে বসিয়া স্বর্গ-বস্তু লাভ করিয়াছেন বলিয়া অনুভব করিলেন এবং আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন;—প্রিয়ে! তুমি এ অধমকে এতদূর ভাল বাসিয়াছ?

ছ।—অধম নয় রত্ন। বহু সাধনার ফলে এ অমূল্য রত্ন লাভ হইয়াছে।

জ।—মিথ্যা কথা—নগণ্য বস্তুর নিমিত্ত সাধনা করিতে হয় না।

ছ।—একটা বস্তু সকলের চক্ষে সমান দেখায় না।

জ।—জেরা মন্দ নয়। আচ্ছা সে সাধনায় কি মন্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল?

ছ।—মহা মন্ত্র—কোরআন।

জ।—সে সাধনার ইতিবৃত্তটা শুনিতে পারি কি?

ছ।—শুনাইতে কোন বাধা নাই বরং আমার মনে হইতেছে তাহা তোমাকে আদ্যপান্ত শুনাইয়া প্রাণ শীতল করি; কিন্তু সে সব দুঃখের কাহিনী শুনিয়া কি করিবে?

জ।—প্রিয়ে আর কোন আপত্তি করিও না।

ছ।—আচ্ছা শুন—তোমার নিকট লজ্জা করিয়া আর কোন কথা গোপন করিব না।

জ।—মেহের্ব্বানি।

ছ।—আমার পঞ্চম বৎসর বয়ক্রমকালে প্রথম বিবাহ হইয়াছিল তাহা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে?

জ।—হাঁ, তাহা জানি।

হু।—বিবাহের অল্প দিবস পরই তিনি পরলোক গমন করেন তাহাও বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই?

জ।—হাঁ, তাহাও অবগত আছি।

হু।—তাহার মৃত্যুতে আমি যে কিরূপ হইয়াছিলাম তাহা মনে নাই, তবে তাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল সে কথা বেশ মনে আছে এবং এখনও সময় সময় সে—।

জ।—(ঈষদ্ধাস্যে) বোধ হয় এখনও তাহার ভালবাসাটুকু সরিয়া যায় নাই?

হু।—কেন, সেটাকি দোষের কথা?

জ।—না, তারপর?

হু।—তারপর ক্রমে আমি সিয়ানা হইয়া উঠিলাম এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সংসারের হাবভাব ও বুঝিতে সক্ষম হইলাম—সেই সময় হইতেই—। এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটা মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জ।—দুঃখ করিও না—সুখ দুঃখ বিধাতার বিধান।

হু। সকল কথা বলিতে গেলে একখানা কেতাব হয়, তবে মোটা-মোটিভাবে বলিতেছি;—বাবা জান জীবিতকালে প্রায় মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীর সকলকে একত্রিত করিয়া হিতোপদেশ ও নানাবিধ রীতিনীতির কথা শিক্ষা দিতেন। একদিন তিনি বলিতেছিলেন; "কোরআন সরিফের ন্যায় বরকতের জিনিষ দুনিয়াতে আর কিছুই নাই। তাহাকে যে ভক্তি-সহকারে পড়ে বা শুনে তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া সদ্যঃপ্রসূতজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয় এবং প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্ত্তে দশ দশটী করিয়া নেকী পায়। তবে নিশিথকালে অথবা নিশার শেষাংশে কোরআন শরিফ তেলাওৎ করাই ভাল। এই সময় কোরআন সরিফ তেলাওৎ করিয়া খোদার নিকট যে কোন সদ্বিষয়ের নিমিত্ত কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করা হয়

কোরআন সরিফের বরকতে নিশ্চয় তাহা কবুল হয়। মানুষের জীবনের ভরসা নাই,—অদ্য তোমাদিগকে একটা মূল্যবান কথা শুনাইতেছি তোমরা সকলেই কোরআন সরিফকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিও। কোরআন সরিফই তোমাদিগকে এই দুঃখময় দুনিয়ার সুখ শান্তি ও পরকালে মুক্তি প্রদানে সহায়তা করিবে। আর তোমাদের মধ্যে কেহ কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে অথবা কোন প্রকার সদেচ্ছাপূর্ণ করিবার মানস করিলে কোরআন শরিফের সাহায্যে খোদাতায়ালাকে আঁকড়িয়া ধরিও তাহা হইলে সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে মুক্তি পাইবে ও সকল সদেচ্ছা পূর্ণ হইবে। কোরআন সরিফকে যে ভক্তির চক্ষে না দেখে খোদা তাহাকে রহমতের চক্ষে দেখেন না ও ভাল বাসেন না। বাবাজানের এই অমৃতময় নসিহত সেই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ে গাঁথা গিয়াছিল।

তুমি হয় ত আমার কথায় মনে মনে হাসিবে। আমি ক্ষুদ্র মতি বালিকা হইলেও সে সময় আমার ভাবিবার শক্তি হইয়াছিল। বাবাজানের এই নসিহত শ্রবণের পরক্ষণেই আমি নির্জ্জনগৃহে বসিয়া স্বীয় অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলাম ;—আমি যখন ভাগ্যদোষে বিধবা হইয়াছি তখন অবশ্যই পুনর্ব্বার পতিগ্রহণ করিতে হইবে ; কিন্তু খোদা আবার যে কিরূপ পতি ঘটাইবেন এবং ভাবী জীবন প্রবাহ কোন মুখে কোন গতিতে গড়াইবে এইরূপ নানাবিধ চিন্তার তাড়নায় একেবারেই অস্থির হইয়া পড়িলাম। সে সময় মনের মত একজন লোককেও খুঁজিয়া পাইলাম না বিধায় কারু পরামর্শও গ্রহণ করা হইল না। তাই অনেক চিন্তার পর বাবাজানের নসিহত অনুযায়ী সেই দিবস হইতেই কোরআন সরিফের ওজিফা শুরু করিলাম।

জ।—প্রিয়ে! এমন কথাও কি আর হাসিবার। আচ্ছা কিসের ওজিফা শুরু করিলে?

হু।—আমার ভাবী জীবন যাহাতে সুখের হয় এবং মন মত পতিলাভ করিতে পারি। এই নিমিত্ত প্রত্যহ নিশিথ সময় ভক্তিভরে কোরআন সরিফ পড়িয়া মনোবাঞ্ছা পূরণ হেতু, প্রাণ খুলিয়া মোনাজাত করিতে আরম্ভ করিলাম। জহুরুদ্দিন মনে মনে বলিলেন,—তুমি মানবী না দেবী? তোমার ন্যায় বালিকা কি আর কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? ধন্য তুমি প্রিয়ে। তৎপর প্রকাশ্যে বলিলেন—তার পর?

হু। এই সময় অনেক ভাল ভাল এবং বড় বড় ঘর হইতে আমার নিকার প্রস্তাব হইতে লাগিল; কিন্তু জানিনা কি কারণে বাবাজান সকল প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। তবে পরস্পর শুনিতাম আমি বয়স্থা না হইলে কোথাও নিকা দিবেন না, কেননা বাল্য-বিবাহের প্রতি তাঁহার অতিশয় ধিক্কার জন্মিয়াছিল।

জ।—তখন কি তুমি নিকার উপযুক্ত হও নাই?

হু।—হইয়াছিলাম বৈ কি, এই যত বড় দেখিতেছ এত বড়ই—যেমনটী দেখিতেছ এমনই। এ তাই দুই এক বৎসরের কথা। এই বলিয়া একটু দন্তবিকাশ করিল।

জ।—তবে?

হু।—বোধ হয় বাবাজানের বিবেচনায় হই নাই।

জ।—আচ্ছা তার পর?

হু।—বিগত বৎসর বাবাজান সহসা জ্বরপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করিলেন এবং তাহার কিছু দিবস পর দুশমনেরা আবার আমাদের বাড়ী পোড়াইয়া দিল: এই বাড়ী পোড়াতে অনেকটাকা ক্ষতি হইয়াছিল তাহাতে ভাইজান একেবারেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গেই—।

জ।—ওজিফা ত্যাগ করিয়াছিলে নাকি?

হু।—না।

জ।—তবে?

হু।—আর বলিব না।

জ।—না বলিলে ছাড়ে কে।

হু।—তুমি জবরদস্তি করিয়া শুনিবে নাকি?

জ।—না তা হবে কেন।

হু।—জবরদস্তি আর কাহাকে বলে? তাহা গাছে ধরে না আকাশ হইতে পড়ে?

জ।—আচ্ছা শেষ কথা, ওজিফার কাম্য বস্তু পাইয়াছ কি?

হু।—নিশ্চয় তাহা অপেক্ষাও বেশী।

জ।—যাহাতে জীবনের সুখ শান্তি ভাবিয়াছিলে তাহাই পাইয়াছ?

হু।—হাঁ।

জ।—(মুচকি হাসিয়া) এখন বিচার কর জবরদস্তি কাহার। তোমার যাহাতে সুখ শান্তি তাহা তুমি পাইয়াছ—তবে যাহা শুনিয়া আমার সুখ তাহা শুনিতে পাইব না কেন?

হুথী চাপা গলায় থিল্ থিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—অমন উকীল, মোক্তারের মত জেরায় কি আর অবলা জাতির বুদ্ধি টেকে।

জ।—পেঁচপাঁচের কথাতেই জেরা বক্তৃতা হয়ে থাকে সোজা কথার বালাই নাই।

হু।—আচ্ছা তবে শুন।

জ।—বেশ, বল।

হু। এই সময় একদিন ভাই জান জানিনা কোথা হইতে একজন পরম সুন্দর যুবককে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাটী আইসেন। যুবকের চেহেরা মোহরা দেখিয়া ফেরেস্তা বলিয়া জ্ঞান হয়। তাই প্রথমে তাহাকে

ভদ্রলোক বলিয়া জানিয়া ছিলাম ; কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম তিনি ভদ্রলোক নহেন চোর চূড়ামণি ; এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার থিল্ থিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জ।—সে যুবক কি তোমার কিছু চুরি করিয়াছিল ?

হৃ।—সর্ব্বস্ব।

জ।—খুলিয়া বল।

হৃ।—সে রাত্রিতে আমি দক্ষিণদ্বারি ঘরে বসিয়া একখানা বই পড়িতে ছিলাম। দুষ্ট যুবক রাত্রিতে আহার করিয়া ঐ ঘরের বারেণ্ডায় আসিয়া বসিল। আমি মনে করিয়াছিলাম বোধ হয় তামাক খাইয়াই উঠিয়া যাইবে ; কিন্তু চোর কি কখন ভাল মানুষ হয় সে উঠিবে কি অমনি নিজের একখানা বিরাট বহি খুলিয়া ভাইজানের সাক্ষাতে পড়িতে লাগিল—আমি বন্দিনী হইলাম। কেননা চোর ঘরের দ্বার বন্দ করিয়া বসিয়াছিল। কি করিব অগত্যা নিজের বই পড়া বন্দ করিয়া চোরের বহি পাঠ শুনিতে লাগিলাম ; কিন্তু চোরের বহির রচনাগুলি এমনই সুন্দর এমনই মাধুর্য্য-মাখা এমনই তাহার বাক্য বিন্যাসের পরিপাট্য যে, আমি তার বহি পাঠ শুনিয়া নিজের বই ভুলিয়া গেলাম।

জ।—চোরের বহিতে কি ভাল কথা থাকে ?

হৃ।—আমি কি তাহা বলিলাম ? কথাগুলি যা তা আবি ঝাবি ভাব ও পরিষ্কার নহে তবে রচনাটা বেশ সুন্দর।

জ।—আচ্ছা বুঝিলাম—তার পর ?

হৃ।—তাহার বহি পাঠ শুনিতে শুনিতে ভাইজানের নেশা থরাইয়া আসিল। তাই তিনি তামাক সাজিতে উঠিয়া গেলেন। এই সুযোগে চোর ঘরের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নিজস্ব করিয়া ফেলিল—ঘরখানা শূন্য পড়িয়া রহিল।

জ। (মুচকি হাসিয়া) বেশ, চোরকে যদি চিনিতে পারিলে এবং স্বচক্ষে চুরি করিতেও দেখিলে তবে তাহাকে ধরিয়া পুলিশে দেওয়া হইলনা কেন ?

ছ।—সে চোর শাসন করা পুলিশের অসাধ্য।

জ।—কেন ?

ছ।—চোর যাতুগর।

জ। ডিক্রীটা বোধ হয় এক তরফা দেওয়া হইল।

ছ।—কিরূপ একতরফা ?

জ।—চোরের ত আর জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল না। সে প্রকৃত চুরি করিয়াছিল না সেখানে নিজের সর্ব্বস্ব হারাইয়া দিয়াছিল।

ছ।—(প্রেমকোপে চক্ষু রাঙ্গাইয়া) আমি তোমাকে আর কোন কথা শুনাইব না।

জ। ক্ষমা—অপরাধ কি দেখিলে ?

ছ।—(কৃত্রিম অভিমানে মুখ ভারী করিয়া) আমি পক্ষপাতী লোক পক্ষপাতী মানুষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস হইবে কেন ?

জ।—আচ্ছা বলিওনা ; কিন্তু তোমার বিবেচনায় যে চোর, এখন সে চোরকে দেখিলে চিনিতে পার এবং তার ঠিকানা বলিতে পার কি ?

ছ।—পারি বৈ কি—নিশ্চয় তার ঠিকানা বলিতে পারি—তাহার নিবাস শ্রীমনপুর, পোষ্ট নয়নপুর, জেলা মালদহ। চিনিতে পারি কি, তাহাকে ইহকাল পরকালের মত চিনিয়াছি। তাহার নামের মোহর হৃদয়-কমলে প্রকটভাবে অঙ্কিত করিয়াছি—দেখিবে সেই চোর ;—এই বলিয়া স্বামীর হস্তদ্বয় ধরিয়া বলিল ;—এই দেখ সেই চোর।

এ পর্য্যন্ত বলিয়া গাল ভরা হাসিতে ঘরখানা আলো করিয়া তুলিল।

সে হাসির কিয়দংশ জহুরউদ্দিন ও গ্রহণ করিলেন এবং স্ত্রীর মুখখানি হাতের উপর তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন ;—“চতুরে !”

অতঃপর হাসির তরঙ্গ থামিলে জহুরউদ্দিন বলিলেন,—তার পর ?

হু।—আর না আজিকার মত থাক আর একদিন বলিব।

জ।—না অন্তই—না শুনিলে ঘুম ধরিবে না।

হু। তাহা হইলে ঘুমের চিকিৎসাই পূর্ব্বে করা হউক।

জ।—চিকিৎসক নিকটে।

হু।—কই ?

জ।—(স্ত্রীর চিবুক ধরিয়া) এই যে। তোমার গল্পই ত ঘুমের ঔষধ।

হু।—দর্শনী।

জ।—হাঁ দেই—।

হু।—কান মন্দে ?

জ।—আমি আর কোন কথা কহিব না।

হু।—রাগ করিলে,—শুন বলিতেছি,—সেই রাত্রিতে তোমাকে দেখিবামাত্রই চিনিয়া ফেলিয়াছিলাম—তুমি যেন আমার কত কালের পরিচিত—বেগানা বলিয়া একেবারেই ভাবিতে পারি নাই।

জ।—বেগানা ভাবিবে কেন তুমি কি ওখানকার বাড়ীতে থাকার সময় আমাকে দেখ নাই।

হু।—ছোট বেলার দেখা যদিও দেখিয়া থাকি মনে নাই।

জ।—তারপর ?

হু।—আর একটা কথা বলিব না।

জ।—কেন বলিবে না ?

হু।—তুমি শুনিলে হাসিবে।

জ।—আচ্ছা হাসিব না।

দু। কথাটা এই যে,—সে সময় আমার মনে হইতেছিল—তোমার নিকট বসিয়া দুই চারিটা কথা বলি ; কিন্তু পারি নাই।

জ।—কেন পার নাই ?

দু। ধর্ম্মের কঠিন বন্ধনে এবং লোকলজ্জার ভয়ে, তুমি যে তখন বেগানা পুরুষ।

জ।—তার পর ?

দু।—ছেলেরা যেমন কোন বস্তুর নিমিত্ত জননীর আঁচল ধরিয়া আবদার করিতে থাকে এবং যে পর্য্যন্ত সে বস্তু না পায় সে পর্য্যন্ত কোন মতেই ছাড়িতে চাহে না আমিও তদ্রূপ সেই রাত্রিতে খোদাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছিলাম।

জ।—কোন বস্তুর নিমিত্ত খোদাকে ধরিয়াছিলে ?

দু।—(ঈষৎ দন্তবিকাশ করিয়া) তোমার মাথা।

জ।—বুঝিয়াছি তার পর ?

দু।—পর দিবস তুমি যে পর্য্যন্ত আমাদের বাটীতে ছিলে সে পর্য্যন্ত কে যেন অলক্ষ্য হইতে আমার হৃদয়ে পিযুষ ঢালিয়া দিতেছিল। সেদিন কেহ না বলিলেও আমি ছোট ভাবীর সঙ্গে তোমার জন্য নাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলাম। তারপর তুমি যখন আমাদের বাটী হইতে বাহির হইয়া বার বার পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলে আর যাইতে ছিলে সে সময় আমি বাটীর সকলের চক্ষু বাঁচাইয়া বাটীর পশ্চাদ্দিকে আসিয়া তোমাকে আর একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া মনে মনে খোদাকে ডাকিয়া বলিয়া ছিলাম ;—"হে রহমান রহিম! দাসীর মনস্কামনা পূর্ণ কর তোমার নামে জোড়া খাসির সাদকা দিব।"

জ।—আচ্ছা যে সময় তুমি আমাকে দেখিতে ছিলে সে সময় তোমার মনে আর কিছু হইয়াছিল কিনা ?

হু ।—হাঁ শত শত বার মনে হইতেছিল তোমাকে ডাকিয়া সে দিবসও থাকিবার জন্য অনুরোধ করি ।

জ ।—ডাক নাই কেন ?

হু । ঐ যে বলিয়াছি ধর্ম্মের বন্ধন ও লোকলজ্জার ভয়ে ।

জ ।—সত্য প্রিয়ে সে সময় আমারও মনে হইতেছিল কে যেন পশ্চাদ্দিক হইতে আমাকে ডাকিতেছে । আচ্ছা যাক—তারপর ?

হু ।—তুমি চলিয়া আসার পর কে যেন বলপূর্ব্বক আমাকে মৌনব্রত পালনে বাধ্য করিল,—ক্রমে হাসি খুসি সবই আমার নিকট বিদায়ের আরজিনামা পেশ করিল ; সেই দিন হইতেই আহারে রুচি হইত না,—বিছানায় সুনিদ্রা ও পদার্পণ করিত না। বলিতে কি সেই রাত্রি হইতেই অনিদ্রাব্রত আরম্ভ করিলাম । প্রত্যেক রাত্রিতে সেই চিরমধুর—চিরসুন্দর নাম ধরিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতাম।

স্নেহপরবশে জহুরউদ্দিনের হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তিনি বুকে হাত চাপিয়া বলিলেন ;—তারপর ?

হু ।—তারপর তুমি যখন ভাই জানের সঙ্গে পত্র লেখা লেখি করিতে সে সময় আমার কলিজাখানি দশ হাত হইয়াছিল ।

জ ।—(ঈষদ্ধাস্যে) জরিপ করা হইয়াছিল কি ? দুখী স্ফীত বক্ষে চক্ষু রাঙ্গাইল, কিন্তু কিছু বলিল না !

জ ।—আচ্ছা তুমি সে সকল পত্রের কথা কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলে ?

হু ।—হাত গণিয়া ।

এই বলিয়া সে স্বামীর পার্শ্বে হইতে উঠিয়া গেল এবং নিজের ট্রাঙ্ক খুলিয়া চারিখানা পত্র বাহির করতঃ একখানা রাখিয়া তিনখানা স্বামীর হস্তে প্রদান করিল। জহুরউদ্দিন দেখিলেন পত্র তিনখানা তাঁহারই হাতের

লেখা। তৎপর বলিলেন ;—তুমি এ সকল পত্র কিরূপে সংগ্রহ করিলে এবং এ সামান্য অকেজো পত্রের প্রতি তোমার এত যত্ন কেন ?

তুখী ভুবন মোহন ব্রীড়াব্যঞ্জক কটাক্ষ ভঙ্গীতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না।

জ।—ওখানা দিলে না ?

তু।—সময় হয় নাই।

জ।—বেশ—সময় হোক।

তু।—তার পরই নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিলাম।

জ।—কি রূপ ?

তুঃ।—তুমি যখন আমার নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছিলে—সে সময় আমাদের বাটীতে মহা গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। নিকার বিষয় নানাজন নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিতেছিলেন। মামু সাহেব ও নানী সাহেবা সতিনের উপর নিকা দিবেন না বলিয়া ঝাড়িয়া যবাব দিয়া ছিলেন। সে সময় ঘটনা এতদূর গড়াইয়া ছিল যে তাহাতে এই শ্রীচরণ প্রান্তে স্থান পাইবার আশা আদৌ করিতে পারি নাই বিধায় নিরাশ আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছিলাম।

জ।—আচ্ছা সেই নৈরাশ্য অন্ধকারের বক্ষঃভেদ করিয়া তোমার মনে কোনরূপ আশার আলো—জ্বলিয়াছিল না দিনের বেলাতেই চক্ষু মুদিয়া তুলিয়া আঁধার করিয়াছিলে ?

তুঃ।—বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু শেষে একটা যুক্তিও স্থির করিয়াছিলাম।

জ।—সেটা কি যুক্তি ?

তুঃ।—তাঁহারা যদি সতিনের উপর নিকা দিতে একান্তই অস্বীকৃত হইতেন তাহা হইলে আমি নিজেই এখানে চলিয়া আসিতাম।

জ।—এখানে আসিলে আমি যদি উপেক্ষা করিতাম ?

জুঃ।—সেরূপ বিশ্বাস হয় নাই।

জ।—কেন—কি সাহসে ?

জু।—সে কথার উত্তর এখন পাওয়া যাইবে না—সে সময় আমার মনকে জিজ্ঞাসা করিলে পাওয়া যাইত।

করুণায় জহুরুদ্দীনের নয়ন প্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন; —তুমি যাহা মনে করিয়া ছিলে তাহাকি করিতে পারিতে ?

জু।—তখন যে কোন বলে বুক বাঁধিয়া সে কথা মনে করিয়া ছিলাম তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু এখন মনে হইতেছে তাহা কোন মতেই পারিতাম না—এখন সে কথা মনে হইলেই শরীর কাঁটা দিয়া উঠে।

জ। আচ্ছা যদি সতিনের উপর এখানে নিকা না দিয়া অন্যত্র দিতেন তাহা হইলে কি করিতে ?

জু।—(প্রেমগর্ব্বে বক্ষঃ ফুলাইয়া) অন্যের মুখে ছাই—কার ক্ষমতা।

জ।—(মুচকি হাসিয়া) তার পর ?

জুঃ।—অনেক বাদানুবাদের পর ভাইজান সকলকে বুঝাইয়া রাজি করিয়াছিলেন তাহাতে যেন আমার মৃতদেহে নবপ্রাণের সঞ্চার হইয়া ছিল; কি তার পর আর একটা সংবাদে বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

জ।—সেটা কি সংবাদ ?

জুন্নী।—চতুর্থ পত্রখানা স্বামীর হাতে দিয়া বলিল;—এই দেখ।

জহুরুদ্দীন দেখিলেন পত্রখানা মৌলবী সাহেবের হাতের লেখা তাহারই পীড়ার সংবাদ। পত্র দর্শনে তাহার মুখ একটু মলিন হইয়া উঠিল তিনি বলিলেন;—তার পর— ?

জুঃ।—কোন প্রকারে এই পত্রখানা হাতে হইলে পড়িবা মাত্রই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলাম।

জ।—মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল ?

ছু।—বলিয়াছি ত বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

জ।—হাপুঁস নয়নে কাঁদিয়া হাট বসাও নাই ?

ছু।—মনে করিয়া ছিলাম ; কিন্তু পারি নাই।

জ।—কেন কেহ নিষেধ করিয়াছিল ?

ছু।—হাঁ—লোক লজ্জা।

জ।—ইহাত তোমার বুদ্ধিমতির ন্যায় কার্য্য হয় নাই। যাহার পীড়ার সংবাদে বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার সে পীড়া আরোগ্যের জন্য তোমাকে কি কোন চেষ্টা করা উচিত ছিল না ?

ছু।—অন্তঃপুরাবদ্ধা অবলাদ্বারা কি হইতে পারে ?—তবে—।

জ।—যাক রাত্রি অধিক হইয়াছে পালা সমাপ্ত কর।

ছু।—আমি পত্রখানা যেখানে পাইয়াছিলাম সেখানে রাখিয়াই বুকে হাত চাপিয়া সরিয়া আসিলাম। সেদিন দুনিয়াটা আমার চক্ষের সামনে ওলট পালট করিতে লাগিল। রাত্রিতে আদৌ নিদ্রা হইল না। কেবল বিছানায় পড়িয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম, চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আমার কলিজাখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া অস্থির হইয়া পড়িল এবং চক্ষের পানি মুছিতে মুছিতে আঁচলও ভিজিয়া গিয়াছিল।

জ।—উহুঃ! তার পর ?

ছু।—তার পর বাবাজানের একটা কথা মনে হইল ;—তিনি বলিতেন ; "কোনরূপ বিপদে পড়িলে মানুষকে অধীর হইতে হয় না—চিত্তসংযম পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হয় এবং সে বিপদ হইতে মুক্তি লাভের কোন উপায় আক্কিলে না যোগাইলে সেই বিপত্তারণ রহিম আল্লাহ তায়ালাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া মোনাজাত করিতে হয়।" বাবাজানের এই উপদেশ বাক্য মনে হইবা মাত্রই আমার দিব্য জ্ঞান হইল। আমি তখনই দু'-

রেকাত নামাজ পড়িয়া খোদার নিকট অনেক কাঁদা কাটা করিয়া তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিলাম। তুমি হয় ত আমার পাগলামী শুনিয়া হাসিবে, সে রাত্রিতে এমন কান্না কাঁদিয়া ছিলাম যে জীবনে তেমন কান্না আর কখনও কাঁদি নাই—আমার বুকের কাপড়ের একটুও শুকা ছিল না।

জ।—প্রিয়ে! ইহাও কি আর হাসিবার কথা।

হু।—তৎপর মৌলবী সাহেবের একটা কথা স্মরণ হইল; তিনি একদিন আমাকে পড়া বুঝাইবার সময় বলিয়া ছিলেন;—"আল্লাহতায়ালার নিয়োজিত বালা-মুছিবত্কে ফিরাইবার সাধ্য কাহারও নাই; কিন্তু এক মাত্র সাদকা তাহা রদ করিয়া থাকে।" এই কথা মনে হইবা মাত্রই ভাবিলাম—অদ্যই মৌলবী সাহেবের সে কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ। বিধায় তখনই খোদাকে ডাকিয়া বলিলাম;—রহমান রহিম! তুমি তাহার জীবন রক্ষা কর—সত্বর নিরাময় কর। আমি তাহার জীবনের বিনিময়ে আমার প্রাণ-তুল্য পালিত খাসি দারোগা ও জমাদারকে তোমার নামে ছদকা করিলাম।

এইরূপে দুঃখময় নিশার প্রভাত হইল। তৎপর ক্রমে জুমার নামাজের সময় হইলে আমি সকল বাধা ঠেলিয়া খাসি জোড়া মছজিদে পাঠাইয়া দিয়া জবেহ করাইয়া দিলাম। সে সময় কে যেন আমার কাণে কাণে বলে গেল—তিনি নিরাময় হইলেন।

জ।—প্রিয়তমে! বলিতে পারি না, কিন্তু সেই শুক্রবার দিবাগত রাত্রিতেই আমি রোগ মুক্ত হইয়াছিলাম। হঠাৎ শরীর হইতে পীড়া সরিয়া গিয়াছিল। আমার বোধ হইতেছে তাহা তোমারই ছদকা ও মোনাজাতের ফলে।

হু।—(ঈষৎ দন্ত বিকাশ পূর্ব্বক) তাহা হইলে ত খোদা আমাকেই তোমার পীড়ার চিকিৎসক করিয়াছিলেন।

জ।—বোধ হয় তাহাই—তোমারই চিকিৎসার ফলে নিরাময় হইয়া ছিলাম—কবিরাজ সাহেবের হাতযশ বেশ!

দু।—তুমি মানুষ ভাল নও।

জ।—কেন, কোন্‌খানা মন্দ দেখলে? চক্ষু টক্ষু ত কাণা হয় নাই?

দু।—তা নয়। তুমি এতদিবস পর্য্যন্ত আমার চিকিৎসার মুল্য দেও নাই কেন?

জ।—হাঁ ভাই সে কথা সত্য,—নানা ঝঞ্চাট বশতঃ এতদিন দিবার অবকাশ পাই নাই—অদ্য দিব—এই লও;—এই বলিয়া স্ত্রীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক দুই গালে দুইটী চুম্বন প্রদান করিলেন।

অতঃপর দুখী নিজের বাক্স খুলিয়া একটা ৫০০৲ টাকার তোড়া আনিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিল;—এই আমার উপাখ্যানের উপসংহার।

জ।—এ আবার কি?

দু।—এ এই—যাহা দেখিতেছ—তাহাই।

জ।—না এবার আমি আর তোমার টাকা গ্রহণ করিব না। তুমি প্রথম বার-ইত জোর করিয়া আমার বাক্সে ২৫০৲ টাকা তুলিয়া দিয়াছ।

দুঃ।—আচ্ছা লইও না কিন্তু এ টাকাগুলি কার।

জ।—তো—।

দুঃ।—আমার? আর আমি কার? এই পর্য্যন্ত বলিতেই তাহার নয়নদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। বালিকা সেই সজল নয়নের করুণ চাহনীতে পতির মুখের প্রতি চাহিল।

স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়াই জহুরুদ্দীন মায়া পাশে আবদ্ধ হইলেন। তিনি কোন কথা না বলিয়াই সহাস্তে টাকার তোড়াটী বাক্সে তুলিলেন।

তৎপর দুখী নিজের বাক্স হইতে আরও ১৫৲ টাকা বাহির করিয়া

স্বামীর হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিল ;—এই টাকার এক জোড়া খাসি কিনিয়া ছদকা দিতে হইবে।

জ।—এবার কিরূপ ছদ্‌কা ?

হ।—ঐযে বলিয়াছি—মানিয়াছিলাম।

জ।—ধন্য তুমি !

অতঃপর পতি ও পত্নী নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

৩০শে ভাদ্র সোমবার—রাত্রি প্রায় ১১টা। অদ্য শওয়াল চন্দ্রের পূর্ণিমা। হিমাংশু ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া কৌমুদী ধারায় ধরাতল ভাসাইতেছে। নির্ম্মল শরতের পাগলা বাতাস গাছ নাড়িয়া ফুল কাঁপাইয়া পরিমল হরণ করিয়া নিস্বার্থভাবে দিগ্দগন্তে ছড়াইয়া দিতেছে। এই সময় একটী পরমাসুন্দরী ললনা স্বীয় শয়নকক্ষে বসিয়া যেন কার অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু যাহার প্রতীক্ষায় প্রাণ অধীর, কই সেত আসিতেছে না—কেন আসিতেছে না তাহা কে বলিয়া দিবে? ললনা বোধ হয় আর প্রতীক্ষা করিতে পারিতেছে না তাই কখন শয়ন খট্টায় বসিয়া—কখন দ্বারে উঁকী মারিয়া কখন বা উৎকণ্ঠায় কান খাড়া করিয়া অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু না তবুও আসিতেছে না, বোধ হয় আজি আর আসিবে না। আর যে প্রতীক্ষা সহ্য হয় না!

রাত্রি অধিক হইল তবুও আসিল না। ললনা এবার অধীর হইয়া অভিমানে মুখ ভার করিয়া সুকোমল শয়নশয্যায় দেহলতিকা ঢালিয়া দিল; তবুও কিন্তু তাহার চক্ষু, কর্ণ সতর্ক।

এই সময় যেন কাহার পদধ্বনি ললনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল সে অমনই নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া এমন কৃত্রিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল যে, সে যেন কত পূর্ব্ব হইতে নিদ্রায় আলু থালু। ললনা দুষ্টী।

এই সময় জহুরউদ্দিন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহার জীবনের সুখ শান্তি প্রদায়িনী নিদ্রায় বিভোরা। তিনি সহসা স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গাইবার

চেষ্টা না করিয়া তাহার নিদ্রালসিত ঢল ঢলে কাঁচা মুখখানির উপর দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক সেই বদন-শতদলের পরিমল সুধা পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু এ সুধাপন তাঁহার অদৃষ্টে অধিকক্ষণ ঘটিল না। কে যেন অলক্ষ্য হইতে হঠাৎ তাহার চক্ষুর সামনে হইতে মুখখানি সরাইয়া লইল। ললনা 'ফিক্' করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল;—তুমি কি দেখিতে ছিলে? জহুর-উদ্দিন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন;—তোমার ঐ লাবণ্য ভরা কাঁচা মুখখানি।

দু।—আমার মুখে এমন কি দেখিবার আছে?

জহুরউদ্দিন স্ত্রীর মুখখানি হাতের উপর করিয়া বলিলেন; আমার জীবনে যদি কিছু দেখিবার থাকে তাহা এই সুন্দর মুখখানিতেই আছে। এ সুন্দর মুখের কাছে কি ছার পূর্ণিমার চাঁদ!

দুখী স্বামীর গলা ধরিয়া বলিল;—এক দিনে অত সোহাগ ঢালিলে চলে? আচ্ছা রাত্রি অধিক হইয়াছে আগে দু'টা আহার কর।

অতঃপর স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে আহার সমাপন পূর্ব্বক দুখী স্বামীর মুখে এক খিলি পান তুলিয়া দিয়া নিজেও একটা চর্ব্বণ করিতে করিতে তামাক সাজিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিল। জহুরউদ্দিন ফরসীর নলে দম দিতে আরম্ভ করিলেন আর দুখী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া "ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

জহুরুদ্দীন স্ত্রীকে হাসিতে দেখিয়া বলিলেন;—দুখী, তুমি কি দেখিয়া হাসিতেছ?

দু।—তুমি আমাকে 'দুখী' বলিয়া ডাক কেন?

জ।—কেন, তোমাকে ওখানে সকলেই যে, 'দুখী' বলিয়া ডাকে? কেবল কি আমার ডাকায় দোষ?

দু।—দোষ ষোল আনা। পরের কথা নিয়ে কাজ নাই—বল তুমি লক্ষ্মীপুর যাইয়া নিকা করেছ কাহাকে ?

জ।—তোমাকে।

দু।—আমি সে কথা জানি না তুমি যাহাকে নিকা করিয়াছ তাহার নাম কি,—কি নামে নিকা পড়া হইয়াছিল ?

জ।—নাম "বিবি সফুরা খাতুন।"

দু।—তুমি সফুরা খাতুনকে বিবাহ করিয়া দুখী বলিয়া ডাক ইহা তোমার দোষ নয় ?

জ।—হাঁ দোষই বটে—তবে সেখানে তোমাকে সকলেই দুখী বলিয়া ডাকে তাই আমিও ডাকি।

দু।—তাহারা আমার দুঃখ দেখিয়াছে তাই দুখী বলে—তুমি আমার কি দুঃখ দেখিয়াছ তাই দুখী বলিবে ?

জ।—জেলাতে তোমার মত দু'চারটী উকিল থাকিলে আর কথা কি। আচ্ছা ভাই দোষ ক্ষমা কর,—কান ধরিয়া বলিতেছি অদ্য হইতে তোমাকে সফুরা খাতুন বলিয়া ডাকিব আর একটু মেহের্ব্বানী করিয়া বল দেখি তোমাকে ওখানে সকলে দুখী বলে কেন ? নাম ত সফুরা খাতুন।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা ! আজি হইতে আমরাও দুখীকে সফুরা খাতুন বলিয়া ডাকিব।

সফুরা।—আমি ছোটতে বিধবা হইয়াছিলাম তাই আমার দুঃখের কপাল জ্ঞানে ম'জান আমাকে দুখী বলিয়া ডাকিয়া থাকেন, তাঁহার দেখা দেখি সকলেই দুখী বলে, তাই সফুরা দুখী।

জ।—তুমি ভাই কিছু বখশিস পাইতে পার।

সফুরা।—কিসের বখশিস ?

জ।—এই যে আমার একটা ভুল সংশোধন করিয়া দিলে তাহারই।

সফুরা।—আর একটা দোষ ধরিয়া দেই তারপর বখশিস।

জ।—বেশ তাহাই হোক।

সফুরা।—তুমি প্রত্যহ অতরাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় থাক?

জ।—মৌলবী সাহেবের নিকট।

সফুরা।—অতরাত্রি ধরিয়া তোমার ওখানে থাকিবার অধিকার কি?

জ।—কি জানি ভাই যেদিন এশার নামাজ পড়িয়া তাঁহার নিকটে বসি সেদিন আর সহজে উঠা হয় না।

সফুরা।—এশার নামাজ দিনে হয় না রাত্রিতে?

জ।—ভুল হয়েছে রাত্রিতে।

সফুরা।—তিনি কি তোমাকে জাদু করিয়াছেন?

জ।—তাঁহার কথাই যাদু। তুমি যদি একদিন তাঁহার কথা শুন তাহা হইলে সে যাদু তোমাকেও আছন্ন করিয়া বসিবে।

সফুরা।—সে যাহাই হউক, কিন্তু আজি হইতে তোমাকে আর এত রাত্রি ধরিয়া সেখানে থাকিতে দিব না।

জ।—সময় না হয় কিছু সংক্ষেপ করা হইবে।

সফুরা।—তাঁহার নিকট অতরাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া লাভ কি?

জ।—লাভ অনেক। আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা একটু জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহা সেই মহাত্মার কাছে উঠা বসা করিয়াই জন্মিয়াছে এবং এই পাপ তাপপূর্ণ দুনিয়াতে তিনিই আমার এক মাত্র বন্ধু। তিনি আমার কার্য্যে নিস্বার্থভাবে সাহায্য না করিলে বোধ হয় তোমাকে লাভ করিতে পারিতাম না।

সফুরা।—তুমি নিজের টাকা খরচ করিয়া স্বেচ্ছায় আমাকে নিকা করিয়াছ তাহাতে আবার তাঁহার সাহায্য কি?

জ।—প্রিয়তমে! নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বালিয়া লাভ কি?

সফুরা।—তাহাতেই ত সুখ—আমি শুনিতেই চাই।

স্ত্রীর এই আব্দার পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে অগত্যা জহুরউদ্দিন তাহার ঘটনার কথা আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে বলিয়া শুনাইলেন এবং মৌলবী সাহেব যেরূপ নিস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়া বার বার তাহার নিকাহের প্রতিবন্ধক সমূহ বিদূরিত করিয়াছিলেন তৎসঙ্গে তাহাও বলিতে ভুলিলেন না।

মৌলবী সাহেবের উপকৃতির কথা শুনিয়া ভক্তিরসে সফুরার হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল, সে একটু নীরব থাকিয়া বলিল ;—কালি সকালে মৌলবী সাহেবের কাছে গিয়া আমার সালাম জানাইও এবং দোওয়া করিতে বলিও। আর আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে কালিকার দাওত দিও।

জ।—এইত তোমাকেও সে জাদু আসর করিয়া বসিল। এই বলিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

স।—তিনি আলেম—আমাদের মাথার মণি—তাঁর দোওয়াতে বরকত আছে।

জহুরউদ্দিন মনে মনে বলিলেন ;—ধন্য হইলাম, খোদা মনমতই রমণী-রত্ন প্রদান করিয়াছে। দয়াময়! কোন মুখে তোমার প্রশংসা করিব। তৎপর প্রকাশ্যে বলিলেন ;—আলিমের দোওয়াতে বরকত আছে একথা তোমাকে কে বলিল?

স।—আব্বাজানের মুখে শুনিয়াছি। তিনি বরাবরই বলিয়া থাকেন আলিম লোকের সেবা শুশ্রূষায় এবং দোওয়া দরুদে বরকত আছে আর তাহাতে গুণাহ মাফ হয় ;—তাঁহারা নবির নায়েব ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া থাকেন। বাবাজান বরাবরই আমাদের বাটীতে একজন মৌলবী সাহেবকে রাখিয়া আসিতেছিলেন। আমরা যা একটু ইলিম হাসিল করিয়াছি তাহা সেই মৌলবী সাহেবের পায়ের বরকতেই হাসিল করিয়াছি। আমাদের বাটী পোড়া যাইবার পর হইতে মৌলবী সাহেব মসজিদে গিয়া

থাকিতেছেন ; তবে ভাইজান একদিন বলিতেছিলেন বাটী তৈয়ারী হইলে আবার মৌলবী সাহেবকে বাটীতে আনিয়া রাখিবেন। আর আমাদের নিকাতে আলিমের সদ্যঃ বরকত দেখিলাম। তাঁহার পরিশ্রম ও দোওয়ায় বরকত না হইলে এই সময় কি তোমার কাছে বসিয়া আলাপ করিতে পারিতাম।

জ।—তবে এখন যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা সেখানে থাকিতে কোন বাধা থাকিল না—এবং আমি নির্দ্দোষ প্রমাণ হইলাম কি বল।

সফুরা মৃদুহাস্যে বলিল;—আজি না আর একদিন বলিব।

জ।—চাতুরী ?

স।—চাতুরী আমার না তোমার ?

জ।—কি করিয়া ?

স।—তুমি একটা বিবি ঘরে রেখে আবার তার সতিন করিলে কেন ?

জ।—তোমার এই সুন্দর মুখের লাবণ্য সুধা পান করিবার জন্য।

স।—ইহা ঠিক উত্তর হইল না।

জ।—তবে তুমিই ঠিক উত্তর বলিয়া দাও।

স।—দিব ?

জ।—দাও।

স।—কাল !

জ।—কাল কি ?

স।—তুমি তাহাকে কাল বলিয়া ঘৃণা কর।

জ।—ইহাই কি তোমার ঠিক উত্তর ?

স।—নিশ্চয়।

জ।—কখনই না।

স।—তোমার 'না' বিশ্বাস হয় না।

জ।—তোমার 'না' আমি ত গ্রহণ করিতে পারি না।

স।—তোমার 'না' আমিও স্বীকার করি না।

জ।—স্বীকার করিতেই হইবে।

স।—না কথনই না—দোষ কাল—কেবলই কাল নচেৎ রণাঙ্গনাদের যুদ্ধ জয়ের নিমিত্ত যে সকল অস্ত্র শস্ত্র থাকা দরকার তাহাত সকলই তাহার নিকট মৌজুদ। এই বলিয়া একটু মুচকি হাসি হাসিল।

জ।—অস্ত্র শস্ত্র আছে সত্য কিন্তু রমণীরা যে রজ্জুতে পুরুষ বাঁধে তা'র নিকট সে রজ্জুর অভাব।

স।—সে রজ্জুও আছে।

জ।—তুমি ঠাট্টা কর আর যাহাই কর; কিন্তু কেবল কাল বলিয়া আমি তাহাকে অবজ্ঞা করি নাই। আল্লার দুনিয়ায় কাল, ধল ত মানুষই হয় এবং অনেক কালর মধ্যে যে কাল মাণিক লুক্কায়িত থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। আমি অদ্য তোমার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি—তাহাকে কাল বলিয়া কোনদিনই ঘৃণা করি নাই অথচ করিবও না। তবে যে কারণে সে আমার অবজ্ঞা-ভাজন হইয়াছে তাহাত তোমার শুনিতে এবং কতক দেখিতে বাকি নাই।

স।—শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি; কিন্তু একটী কথা—তাহার জন্য তুমিও দায়ী।

জ।—কি করিয়া?

স।—তাহার জন্য কেবল তিনিই যে দায়ী তাহা নহে, তাহার জন্য তুমিও দায়ী। কেন না একদিন বাবাজানের নিকট শুনিয়াছিলাম;—কেয়ামতেরদিন প্রত্যেক রমণীর নিমিত্ত চারিটী করিয়া পুরুষ ধরা যাইবে অর্থাৎ কোন রমণীর নামাজ, রোজা, পর্দ্দা, পাকি না পাকি, রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয় কোনরূপ অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সে সকল অপরাধের নিমিত্ত

সে রমণীর পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বামী দায়ী হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার জন্য তুমিও দায়ী।

জ।—কথাটা সত্যই; কিন্তু আমি তাহার জন্য দায়ী হইতে পারি না।

স।—কেন ?

জ।—অনেক করিয়াও তাহাকে পথ ধরাইতে পারি নাই। বুঝাইলে যে না বুঝে তাহার জন্য আর কি করা যাইতে পারে? আমার কর্ত্তব্য—পালন করিতে আমি ত্রুটী করি নাই।

স।—শিক্ষা দিলে বনের বানরও শিক্ষা পাইয়া থাকে—তিনি মানুষ বৈত না।

জ।—মানুষ বটে কিন্তু—।

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া সফুরা বলিল;—তোমার কিন্তু টিন্তু থাক—বাবাজানের মুখে শুনিয়াছিলাম—মানুষকে কোন মতেই দমিতে নাই। তোমাকে আর একবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং অন্য হইতে আমিও তাহাকে পথ ধরাইতে প্রাণপণে পরিশ্রম করিব, ইহাতে বোধ হয় তুমি আপত্তি করিবে না। আর দেখ একটা মানুষকে যদি আমরা মানুষ করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে কত নেকীর বিষয়। বিশেষতঃ তিনিও খোদার একটা সৃষ্ট জীব। তিনি নিজ পায়ে দোজখের দিকে হাটিয়া গেলে তাহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

জ।—মানুষকে মানুষ করিয়া তোলা আবার কিরূপ? এটা ভাই আজি নূতন কথা শুনিলাম।

স।—তুমি ওসব উকীল মোক্তারের মত জেরা রাখ—আমি যাহা বলিলাম তাহা করিতেই হইবে।

জহরুদ্দীন মনে মনে স্ত্রীর প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না; কিন্তু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন;—সতিনের সঙ্গে মিশিতে এত সাধ কেন?

স।—কেন, সতিনের সঙ্গে মিশিয়া থাকা কি পাপ ?

জ।—না, নেকী।

স।—তবে হেলা করে এ নেকী ছাড়িব কেন ? আমার কি নেকী বেশী হইবে।

সফুরা খাতুন এই পর্য্যন্ত বলিয়াছে ইতিমধ্যে বাটীতে একটা গোল উঠিল, "আগুন আগুন" জহুরুদ্দীন এক লম্ফে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার রান্নাঘরে দাউ দাউ করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে। তিনি চীৎকার করিয়া রান্না ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। বাটীর চাকর বাকরেরা যে যেথানে ছিল দৌড়িয়া আসিয়া আগুন নিবাইতে লাগিল। শরৎকাল এবং ঘরখানা দেওয়ালের বলিয়া সহজেই অগ্নি নিবাইয়া ফেলিলেন। অগ্নি নিবাইয়া সকলেই দেখিতে পাইল ঘরে একটা রমণী অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"দেখিলে আমার কথা ফলিল। আমি তোমার নিকট কত অনুনয়-বিনয় করিলাম, কত বলিয়া বুঝাইলাম, একবার নয় দু'দু' বার সৎপরামর্শ কানে গুঁজিয়া দিলাম ; কিন্তু তবুও তোমাকে পথ ধরাইতে পারিলাম না। সর্ব্বনেশে তুমি, আমাকে নানা মতে ভুলাইয়া আদুরে ভাইয়ের নিকা দিলে ত ছাড়লে এখন ভেবে দেখ ত কতদূর অধঃপাতে গিয়াছ—ধিক্ তোমাকে।" এই বলিয়া শামস উদ্দিনের স্ত্রীর লাল চক্ষে স্বীয় মুখের প্রতি চাহিল।

শামসউদ্দিন মলিন মুখে একটু নীরব থাকিয়া অপরাধী মানুষের ন্যায় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন ;—বাস্তবিকই পূর্ব্বে না বুঝিয়া ভাইয়ের মহব্বতে পড়ে বড়ই মূর্খের মত কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।

স্ত্রী।—এখন মূর্খতা স্বীকার করিলে কি হইবে—তোমার ঘুমের ঘোর ত ভাঙ্গিয়াছে।

শা।—তা আর ভাবিয়া কি করিব সব কপাল।

স্ত্রী।—আর কি এখন গালে চূণকালি ল'য়ে কপালের দোষ। কপাল ত আর কিছু বলিতে জানে না তাই তার দোষ পদে পদে। তুমি যদি পূর্ব্বে আমার কথা শুনিতে, তাহা হইলে নিজের অত ক্ষতি করে তাহাকে রাজা করিয়া নিজে ফকির হইবে কেন? পোড়া মুখো তুমি, তোমাকে আর কি বলিব।

শা। রাজা, ফকির আর কত কি, তবে ঐ দিক হইতে যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াছে তাই যা।

স্ত্রী।—(বেগে মুখনাড়া দিয়া) তুমি বাদশা জাদা না—তাই তোমার

চক্ষে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া বোধ হইতেছে। একবার হিসাব করিয়া দেখত সে কত টাকার বস্তু আনিয়া ঘরে তুলিয়াছে। এইত মোটা মোটি ধরিতে গেলে যে সকল বাছী পাইয়াছে সেগুলির দাম প্রায় ১০০৲ টাকা। গাভীটার দামও ৭০৲ টাকারি কম নয়; আর শোয়ারার জন্য যে বলদ জোড়া পাইয়াছে, লোকে বলিতেছে আজকালকার বাজারে সে জোড়ার দামও ২০০৲ টাকা হইবে। তা'ছাড়া আসবাব পত্র যাহা পাইয়াছে; সে সকলও ৪।৫ শত টাকার এক পয়সাও কম হইবে না। ইহা ব্যতীত আরও হাজার খানেক নগদ টাকা আনিয়া বাক্সে তুলিয়াছে। বল ত এ সকলের নামে তোমাকে একখানা বাসী ঝাটাও মারিবে কি?

শা।—তুমি টাকার কথা কিরূপে জানিতে পারিলে?

স্ত্রী।—আমি ত আর তোমার মত নই যেমনি খাওয়া অমনি পড়া সেদিন রাত্রে আড়ি পাতিয়া শুনিয়াছি।

শা।—কি জানি হইলেও হইতে পারে।

স্ত্রী।—হইতে পারে নয় আমি নিজ কাণে শুনিয়াছি নগদ টাকা আনিয়া বাক্সে তুলিয়াছে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর বা না কর, কিন্তু আমি ত নিজের কানকে অবিশ্বাস করিতে পারি না। আরো শুন— কাপড় চোপড় অনেক পাইয়াছে; তুমি ত সে সকলের কোন খোঁজ খবর রাখ না। তোমার আদুরে ভাই এখন যেমন কাপড়, জামা, জুতা ইত্যাদি পরিয়া বেড়ায় সেরূপ কাপড় চোপড়, জামা, জুতা তুমি কি কখন দেখিয়াছিলে? পোড়া কপালে মাঠখাটা তুমি! আর তোমার নূতন ভাই বৌ যেরূপ শাড়ী ও গহনার ঝালাবর হইয়া আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া পা ফেলিতেছে, তাহা কি মানুষের প্রাণে সহে? ফকির মিনসে তুমি, সেরূপ গহনা, কাপড় আমাকে কোনদিন দিয়াছিলে, না দিতে পারিবে? আমার নামে ত সবেতেই আগুন লাগিয়া যায়? বানর

মুখি ছুঁড়িটার কাছে আমি যেন মানুষই নই। মুখের মত মুখ হইলে না জানি আরো কত কি হইত। হায় আমার প্রাণে যে আর সহে না আমি কি করিব!

এই পর্য্যন্ত বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর নাকি স্বরে পরিণত হইল। সে আবার নাকি স্বরে বলিতে লাগিল;—"দেখ এত অন্যায় আর সহ্য হয় না। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যায়,—তুমি রোদ বাতাসে মাঠে খাটিয়া সোনার শরীর মাটি করিবে আর সে ছাতা জুতা পরিয়া বাবুগিরি করিয়া ভরা গৃহস্থালী উচ্ছন্ন করিবে ইহা কার প্রাণে সহে? পৃথক হইবার সময় সে কি ভাগ কম লইবে? সে যে রাত দিন পথে পথে বেড়ায়—কাকে মহাজনে টাকা কর্জ্জ দিতেছে না তাহার জামিন হইতে যায়, কাকে মহাজনে ডাঁড়িয়া লইতেছে তাহার সোপরশী করিতে যায়; রাজার কাছারীতে যাইয়া গোটা গ্রামের ঝঞ্ঝাট মিটায় কোথায় কে শাশুড়ী বৌএ ঝগড়া করিতেছে—কোথায় ভাইয়ে ভাইয়ে মনান্তর ঘটিয়াছে,—কোথায় আইল চাপাচাপি,—কোথাকার কাজিয়া মারামারি ইত্যাদির সালীশ করিয়া বেড়ায়—গ্রামের মধ্যে কে খাইতে পাইতেছে না, কার কাপড় নাই, কার হালের গরু নাই কার কি নাই এ সকলের খোঁজ খবরগিরি করিয়া বেড়ায় আচ্ছা বল দেখি এ সকল করিয়া কি কখন তোমার হাতে একটা কানা কড়িও আনিয়া দিয়াছে, না দিবে? দেখলে ত সে বচ্ছর বাণে দেশ ডবে গিয়ে সব ফসল নষ্ট হয়ে গেল, কার ঘর পড়ল, কার গরু ছাগল ভেসে গেল, দেশ জুড়ে "হা অন্ন হা অন্ন" রব উঠল, তাহার জন্য সে নিজের টাকা খরচ করে একমাস কাল রাজবাড়ী দৌড়াদৌড়ি করিল, তাহার ফলে দেখিবে ত রাজা সাহেব গোটা গ্রামের মানুষকে তিনমাস কাল খরচ দিয়া পুষিলেন, কার হালের গরু হইল, কার কি হইল; কিন্তু বল দেখি তাহাতে তোমার ভাগ্যে একটা পয়সাও জুটিয়াছিল কি? আমাদের

সে বাপে ত কিছুই ক্ষতি হয় নাই, তবে তুমি তিনমাস কাল চাকর পাইট লইয়া মাঠে খাটিলে আর সে নিজের টাকা খরচ করিয়া সকলের উপকার করিয়া বেড়াইল কেন? আরো দেখ একটা সর্ব্বনেশে মাদ্রাসা খুলেছে, তাহাতেও শুনিতেছি গ্রামের সব চাঁদা চুঁদি দিয়াও নাকি মাসে মাসে ৫।১০ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হয়—তোমার রক্ত পানি করা টাকা এরূপভাবে নিজ মনে যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিবার তার অধিকার কি? আর শুনিয়াছ সে নাকি বলে 'গ্রামে বাস করিয়া যদি জীবনে সে গ্রামের কিছু হিতকর কাজ না করিল, তাহা হইলে সে মানুষ নয়—মানুষ নামের কলঙ্ক মাত্র—একটা রক্ত মাংসের স্তূপ।' বুঝিয়াছ এ সকল খোচা মারা কথা। সে ঐ সব করে আর তুমি মাঠে খাট এবং আমি মধ্যে মধ্যে প্রতিবাদ করি তাই সে মানুষ—আর তুমি, আমি রক্ত মাংসের স্তূপ। দেখ ত এ সকল কথা কি প্রাণে সহে? এমন কথা ত মরা মানুষের গায়েও সহে না?"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইল। সে ফিক্‌রিয়া ফিক্‌রিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কান্না থামিল, কিন্তু সুর থামিল না; পুনরায় কাঁদ কাঁদ-স্বরে বলিতে লাগিল;—"আমি বলিতেছি নিকার দু'মাসও পূর্ণ হয় নাই তাতেই তার ঘর ভরে গেল এবং তোমার সব উচ্ছন্ন গেল। আমার চক্ষে আর সহে না, তুমি হাতে ধরিয়া আমার মুশাকে ফকির করিলে। আজি যদি তোমার ভাল মন্দ হয় তাহা হইলে আমার মুশা কোথায় দাঁড়াইবে? তুমি পিতা হইয়া হাতে ধরিয়া ছেলের সর্ব্বনাশ করিলে। আর ঐ যে মরার মত বাড়ীতে একটা মানুষ না ভূত পড়িয়া আছে তাহার দুর্গন্ধে বাড়ীতে আর টেকা যায় না। তুমি আজি আমাকে একটা উত্তর দাও আমি আর সহিতে পারি না।"

শামসউদ্দিন এতক্ষণ ধরিয়া নীরবে স্ত্রীর কথা শুনিতেছিলেন এবং সে সকল কথা মনে মনে মিলাইয়া দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন স্ত্রীর কথা কোনটাই ফেলিবার নহে। বিধায় এবার তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন "কাল সকালে কার্য্যের দ্বারাই উত্তর দিব।" এই বলিয়া সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। স্ত্রী মুখ নাড়া দিয়া বলিল—"দেখিব তোমার মর্দ্দামী।"

শামসউদ্দিন এইবার স্বীয় বাক্য কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইলেন। তিনি সকল বাধা ঠেলিয়া পর দিবসই পৃথক হইয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় শাশুড়ী পুত্রবধূকে বলিলেন ;—ফয়েজানের মার অসুখ, কাল সে কাজ করিতে আসিতে পারিবে না এবং কাল বাড়ীতে অনেক পাইট মজুর কাজ করিতে আসিবে, তাদের খাবার দিতে হইবে, তুমি খুব সকালে উঠিয়া ধান সিদ্ধ করিও। কেননা কাল ধান সিদ্ধ না করিলেও চলিবে না। এই বলিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। বধূটীও শয়ন করিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরই বধূটীর নিদ্রা ছুটিয়া যায়, সে চম্‌কিয়া উঠিয়া ভাবিল বোধ হয় আর রাত্রি নাই ধান সিদ্ধ করিব কখন। এই কথা ভাবিয়া তখনই উঠিয়া ধানসিদ্ধ করিতে আরম্ভ করে ; কিন্তু নিদ্রার একটা সময় আছে ; সে সময় মত কারু উপরোধ অনুরোধ, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পাদনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বধূটী বসিয়া উনানে আঁচ দিতেছিল এবং নিদ্রাক্রমনে কখন সম্মুখে, কখন দক্ষিণে, কখন বামে ঝুকিয়া ঝুকিয়া ঝিমাইতেছিল। কখন বা পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইয়াও স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছিল ; কিন্তু নিদ্রা যখন অত্যন্ত চাপিয়া ধরিল হতভাগিনী তখন আর নিজ কর্ত্তব্যকার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিল না। আগুন ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া, পার্শ্বের জ্বালনী কাষ্ঠসমূহ ধরিয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে হতভাগিনীর পরিধান বস্ত্রখানাও ধরিতে ক্রুটী করিল না।

এইবার অগ্নিতাপে অভাগীর চৈতন্য সম্পাদন হইল। সে অচিরাৎ "আগুন আগুন" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে লাফাইতে লাগিল

সে সময় তাহার ভাবিবার শক্তি ছিল কিনা বলিতে পারি না, সে যতই লাফাইতে লাগিল ততই যেন অনলের সাহায্য করিতে লাগিল। আগুন তাহার দেহের কতকাংশ এবং মুখ খানাকে সুন্দর ভাবে স্পর্শ করিল। হতভাগিনী কাপড় খুচিতে খুচিতে ও দেহ মুখ চাঁপড়াইতে চাঁপড়াইতে ভূতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য বধুটী জহুর উদ্দিনের প্রথমা স্ত্রী। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে আমাদের পাঠক পাঠিকা তাহা অবগত আছেন।

জহুরউদ্দিনের প্রথমা স্ত্রী মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত। সে পোড়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়াগ্রামের চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু পোড়া ঘা উপশমের কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ঘা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। তাহার মুখ এবং শরীরের অনেক স্থান পচিয়া অনবরত রক্ত পূঁজ বহিতেছে। তাহার দুর্গন্ধে সে ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইতেও কেহ প্রস্তুত নহে। তাহাতে আবার প্রত্যহ একটু করিয়া জ্বর হইতেছে—এ অবস্থায় তাহার শুশ্রূষা করে কে?—দুনিয়াতে যাহার মাতা পিতা নাই, ভ্রাতা ভগ্নি নাই, পতির ভালবাসা নাই, শাশুড়ীর আদর নাই, কারু সঙ্গে সদ্ভাব নাই এ অবস্থায় এমন চরম দুঃখের সময় তাহাকে দেখিবে কে? তাহার এই আসন্ন মৃত্যুকালে শুশ্রূষাকারিণী একমাত্র ছোট সতিন সফুরা।

বধুটী দগ্ধ হইবার পর দুই সপ্তাহকাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দুই সপ্তাহ ধরিয়া সফুরা সংসারের কোন কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারে নাই কেবল প্রাণপণে সতিনের শুশ্রূষা করিতেছে। ঘায়ের রক্তপূঁজ পরিষ্কার করা, ঔষধ লাগান, পিপাসায় জলদান, পথ্য পাক, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কার্য্য নিজ হস্তে করিতেছে; সে অনেক সময় পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে করিতে গায়ে ও মাথায় হাত বুলাইয়া বলে;—"বুবু, আজি তোমার কেমন বোধ হইতেছে?"

অদ্য রোগিণীর অবস্থা বড়ই আশঙ্কাজনক। হতভাগিনী ঘায়ের জ্বালায়, জ্বরের প্রকোপে বড়ই অস্থির—অত্যন্ত কাতরভাবে ছটফট করিতেছে। কখন সজ্ঞানে কখন অজ্ঞানে নানাপ্রকার প্রলাপ বকিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে কি যেন দেখিয়া চম্‌কিয়া চম্‌কিয়া উঠিতেছে। এ অবস্থাকালে তাহার নিকট বাটীর কেহই নাই, কেবলমাত্র ছোট সতিন সফুরা খাতুন পার্শ্বে বসিয়া সাশ্রুলোচনে মধ্যে মধ্যে তাহার মুখে সরবৎ দিতেছে। রোগিণী মাঝে মাঝে ;—"মা' গো—উহুঃ—প্রাণ-গেল।" বলিয়া প্রলাপ বকিতেছে। শুশ্রূষাকারিণী বলিতেছে ;—"অমন কথা বলিতে নাই আল্লা আল্লা বল।" রোগিণী এক এক বার "আল্লা আল্লা" বলিয়া পনরায় পূর্ব্ব সুর ধরিতেছে।

ইতোমধ্যে সহসা রোগিনীর তন্দ্রা ছুটীয়া গেল, সে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে সতিনের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল ;—"উহুঃ প্রাণ যায়! আর বাঁচবনা। মরণকালে একবার তাহাকে—মা—মা" এই পর্য্যন্ত বলিতেই তাহার বাক্‌রোধ হইয়া আসিল—নয়নজলে গণ্ডদ্বয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সফুরা রোগিণীর আসন্ন মৃত্যুকাল বুঝিয়া বাটীর চাকরাণী দ্বারা স্বামীকে ডাকাইয়া পাঠাইল, একটু পরই জহুরউদ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন তখন রোগিণীর উর্দ্ধশ্বাস আরম্ভ হইয়া মৃত্যুর যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন একটা প্রাণীর মুমূর্ষু অবস্থা দেখিলে কোন হৃদয়বাণ ব্যক্তির চক্ষেই না জল আসে? জহুরউদ্দিনের চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। তিনি সজল নয়নে রোগিনীকে বলিলেন ;—"তুমি আমায় কিছু বলিতে চাও কি?" রোগিনী পতির মুখের প্রতি চাহিয়া কি যেন বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারিল না।

জহুরউদ্দিনের চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন ;—"আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম—খোদা ক্ষমা করুণ।"

এই সময় জহুরউদ্দিনের জননী তথায় উপস্থিত হইয়া রোগিনীর অবস্থা দর্শনে উচ্চ রবে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ইতঃমধ্যে রোগিনীর খেঁচনী আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ হাত, পা গুটাইয়া আসিতে লাগিল। সফুরা কাঁদিয়া স্বামীকে বলিল; "বোধ হয় গেল আর বাঁচিল না। তুমি জলদি সুরাইয়াশিন পড়।" এই বলিয়া ঘন ঘন রোগিনীর মুখে সরবৎ দিতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে অভাগীর হাত, পা অবশ হইয়া দেখিতে দেখিতে প্রাণপাখিটী কোথায় উড়িয়া গেল। সফুরা অশুচ্চরবে এবং তাহার শাশুড়ী উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জহুর উদ্দিন অশ্রুপাত করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অতঃপর মৃতদেহের সৎক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হতভাগিনীর মৃত্যুতে কেহ কাঁদিল, কেহ হাসিল, কেহ দুঃখ প্রকাশ করিল এবং কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "আজি হইতে সফুরা নিষ্কণ্টক হইল।" সফুরা কিন্তু খোদাকে ডাকিয়া বলিল, "অমন করিয়া অকালে একটী অবলার প্রাণপাখিটী কাড়িয়া লইলে কেন? সতিনের সঙ্গে মিলিয়া ঘর করা—বড় ভগ্নির ন্যায় তাবেদারী করিয়া জগৎকে দেখাইতে দিলে না কেন? মনের সাধ যে মনেই রহিয়া গেল।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কালের আবহমান গতি ক্রমে প্রাবৃট্ ও শরৎ ঋতুদ্বয় অতীত হইয়া হেমন্ত ঋতু পদার্পণ করিয়াছে এই বিগত চারিমাস ধরিয়া আবদুল মতিন বিশ্বাস সপরিবারে মাতুলালয়ে বাস করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু অপরের বাটী বাস করা আর কতদিন চলে ? এখন তাহার মনে দুইটী চিন্তা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে ! প্রথম চিন্তা ভগ্নবাটীখানার সংস্কার করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করা এবং দ্বিতীয় চিন্তা যে কোন উপায়ে হউক অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক দেনা পরিশোধ করিয়া বাগান ফিরাইয়া লওয়া। সদাশয় মাড়োয়ারী বলিয়াছেন—আপনি টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলেই বাগান ফিরাইয়া দিব।

হেমন্ত কালের প্রারম্ভ হইতেই তিনি বাটীর সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং খুব জোরে কার্য্য চালাইয়া অগ্রহায়ণ মাসের শেষাংশেই বাটীখানাকে বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। অতঃপর সপরিবারে তাহাতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এখন তাহার প্রধান চিন্তা কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দেনা পরিশোধ পূর্ব্বক বাগান ফিরাইয়া লইবেন। বিশেষতঃ সত্বর বাগান ফিরাইয়া লইবার নিমিত্ত বাটীর সকলেই বায়না ধরিয়াছে। গৃহস্থালীতে যাহা আয় হয় তাহার ব্যয় বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে অল্প দিনে দেনা শোধ হইতে পারে না বিধায় কোন একটা ব্যবসায় না করিলে আর কোন উপায় নাই ; কিন্তু ব্যবসায় কি করিবেন ? তিনি অনেক চিন্তা করিয়া শেষে পূর্ব্বের সেই রেশমের সূতা কাটা কারবার

করাই স্থির করিয়া যাইগুলি ও তাহার যাবতীয় সরঞ্জাম ঠিক করিয়া পুঁজির টাকা বাহির করিতে পারিলেন না। কেননা তিনি একে ত প্রায় ৫।৬ সহস্র টাকার দেনায় ফাঁসিয়া আছেন তাহার আবার অন্ততঃ পক্ষে ৪।৫ হাজার টাকা মূলধন না হইলে কারবার চলিতে পারে না। এই ৪।৫ সহস্র টাকা একযোগে একজন গৃহস্থকে কেহই দিতে রাজি হইল না বিধায় তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন একবার জহুরুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। কি জানি এই সময় তিনি যদি কোনরূপ সৎ পরামর্শ দিতে পারে অথবা তাহার দ্বারা কোন প্রকার উপকার দর্শে। তিনি এই যুক্তি স্থির পূর্ব্বক একদা কামডোল যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপর স্বীয় অভিপ্রায়ের কথা জহুরুদ্দীনকে জ্ঞাপন করিয়া পরামর্শ চাহিলেন এবং জহুরুদ্দীন যদি তাহার সঙ্গে আংশিকভাবে কারবার করেন তাহা হইলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন তৎসঙ্গে এ কথাও বলিতে ভুলিলেন না।

জহুরুদ্দীন চেষ্টা করিলে টাকা লইয়া দিতে পারেন একথার আশ্বাস তখনই আবদুল মতিন বিশ্বাসকে প্রদান করিলেন; কিন্তু সঙ্গে কারবার করিবেন কিনা সে কথার উত্তর সে সময় না দিয়া রাত্রির মত সময় লইলেন এবং নৈশ ভোজন সমাপনান্তর নিজের শয়ন গৃহে বসিয়া স্ত্রীকে সকল কথা বলিয়া তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। সফুরা তাহাকে উৎসাহ দিয়া সঙ্গে কারবার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল এবং তাহার পিতা সূতার কারবার করিয়া অল্প দিবসে যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন তাহাও বলিয়া শুনাইলেন।

জহুরুদ্দীন স্ত্রীর কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন; তোমার আদেশ উপদেশ আমার শিরোধার্য্য, কারবার করিলে লাভবান হইতে পারিব সে আশা আমিও করি; কিন্তু টাকা?

স।—তোমার তহবিলে।

জ।—কুলাইবে না।

স।—ভাইজান কত টাকার কথা বলিতেছেন?

জ।—তিনি বলেন আপাততঃ ৪।৫ হাজার টাকা হইলে ব্যবসায় খোলা যাইতে পারে।

স।—তিনি ঘর হইতে কিছু টাকা দিতে পারিবেন?

জ।—খুব জোর হাজার খানেক।

স।—তোমার তহবিলে এখন কত টাকা জমা আছে?

জ।—টাকা কোথায়—তোমার প্রদত্ত তহবিলে সেই ৭৫০৲ টাকা, ইহা ব্যতীত আরও হাজার দু'আড়াই হইতে পারে।

স।—তবে কেন তুমি দুই হাজার দাও এবং ভাইজান এক হাজার দিউক আর আপাততঃ এক হাজার টাকা কর্জ্জ লইয়া আল্লার নামে কারবার আরম্ভ করিয়া দাও।

জ।—কর্জ্জের নামে আমার বড় ভয় পায়।

স।—ভয় কিসের? তুমি ত আর কর্জ্জ লইতেছ না সেটা হইতেছে ভাইজানের অংশের তাহারই নামে দলিল লিখাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে ত আর কোন ভয় থাকিতে পারে না।

জহুরুদ্দীন স্ত্রীর কথা স্বীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর পর দিবস আবদুল মতিন বিশ্বাসকে সঙ্গে লইয়া পুকুরিয়া গমন পূর্ব্বক জনৈক মহাজনের নিকট হইতে ১০০০৲ টাকা কর্জ্জ লইলেন। এই টাকার দলিল আবদুল মতিন বিশ্বাসের নামে লেখা হইল; কিন্তু জামিন থাকিলেন জহুরুদ্দীন।

অতঃপর উল্লিখিত ৪০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া তাহাদের দুই অংশে ব্যবসায় আরম্ভ হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কারবার আরম্ভ হইবার পর দেখিতে দেখিতে সাতটীমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আবদুল মতিন বিশ্বাস্ মহোদ্যোগে কারবার পরিচালন করিতেছেন। জহুর উদ্দিন মধ্যে মধ্যে লক্ষ্মীপুর যাইয়া কারবারের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছেন, অদ্য আবার তাহার লক্ষ্মীপুর যাইবার কথা সুতরাং তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাটীর জনৈক চাকরকে গাড়ী সাজাইয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। মনিবের আদেশানুযায়ী চাকরটী গাড়ী সাজাইয়া বহির্ব্বাটীতে মনিবের অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু রাত্রি অধিক হইতেছে তবুও মনিব সাহেব বাটী হইতে বহির্গত হইতেছেন না।

জহুর উদ্দিনের বাটী হইতে বহির্গত হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তিনি নৈশাহার শেষ করিয়া ধূম পান করিতেছেন, এই ধূম পান শেষ হইলেই গাড়ীতে উঠিবেন। তিনি ফরসীর নলে দম দিতেছেন এবং তাহার প্রিয়তমা পত্নী সফুরা সম্মুখে দাঁড়াইয়া "মা ও বাটীর সকলে কেমন আছে—রাহেলা মৌলবী সাহেবের কাছে পড়ে ত—আমার জন্ত রেশমের ভাল এক ফেটী সূতা আনিও।" এইরূপ নানা কথা বলিতেছে জহুর উদ্দিন ফরসীর নলে দম দিতেছেন আর স্ত্রীর মধুমাখা কথাগুলি শুনিতেছেন। কিন্তু ফরসীটী তাহাকে যথেষ্ট ধূম প্রদান করিতে পারিতেছে না। তাই তিনি একবার কলকেটার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, বোধ হয় আগুন হইল না।

তাহার এই কথা শ্রবণমাত্রই সফুরা ফরসীর উপর হইতে কলকেটা

লুফিয়া লইয়া প্রস্থান করিল এবং একটু পরই কলকেটাতে ফুৎকার দিতে দিতে গৃহে প্রবেশ করিল। সফুরা বারংবার কলকেতে ফুৎকার দিতে-ছিল এবং ফুৎকার চোটে কলকেস্থিত অনল দীপিয়া দীপিয়া সেই দীপ্তমতি সুন্দরীর দীপানল আরও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। মরি মরি! কি অপূর্ব্ব শোভা!! জহুর উদ্দিন একদৃষ্টে স্ত্রীর মুখের সেই অপূর্ব্ব শোভা চক্ষু ভরিয়া—প্রাণ পুরিয়া দেখিতেছিলেন। আনন্দে তাহার মনঃ উথলিয়া উঠিতেছিল। তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন,—কি সুন্দর মুখখানি তোমার।

সফুরা কলকেটা ফরসীর উপর রাখিতেছে এমন সময় যামঘোষগণ সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া উঠিলেন,—"হু—হু—হুক্কা—হুক্কা—ক্যা—ক্যা—ক্যাহুয়া—ক্যায়াহুয়া—ক্যা—ক্যা—ক্যা।"

জহুর উদ্দিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে হবে কি এই যে খুম পান হচ্ছে।" এই বলিয়া ফরসীর নলে দম কষিতে লাগিলেন। পতির বাক্য শুনিয়া সফুরা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—আমি একটা কথা শুনিয়াছি। জহুর উদ্দিন স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন;—কি কথা?

স।—বলিব না, তুমি শুনিলে রাগ করিবে।

জ। কথাটা কি এমনই পাজি যে, শুনিলেই রাগিয়া উঠিব?

স।—হাঁ, তুমি শুনিলেই রাগ করিবে।

জ।—আমি কি কোন দিন তোমার কথায় রাগ করিয়াছিলাম?

স।—আমি রাগজনক কিছু করিলে অথবা বলিলেইত আমার উপর রাগ করিবে।

জ। আচ্ছা ধরিয়া লও অদ্য তুমি প্রথম আমার রাগজনক কথা বলিলে এবং আমিও তোমার প্রথম অপরাধ বলিয়া তাহা ক্ষমা করিলাম।

স।—সত্য নাকি ?

জ।—আমি কি কোন দিন তোমার নিকট মিথ্যা বলিয়া থাকি ?

স। (ঈষদ্ধাস্যে) মামলা পেশ না হইতেই ডিক্রী।

জ।—হাঁ তাহাই—তুমি বল।

স।—আচ্ছা তুমি তামাক খাও আর আমি বলি নচেৎ আবার তোমার ফরসী ধুম দিতে বোখিলী করিবে।

জ।—না আগে শুনি তারপর।

স।—তবে শুন—আমি শুনিয়াছি দুনিয়াতে যাহারা তামাক খায় তাহারা মরিয়া যাইবার পর নাকি শিয়াল হইয়া "হুক্কা হুক্কা" করিয়া তামাক খাইতে চায়।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। স্ত্রীর কথায় জহুরউদ্দিনও না হাসিয়া পারিলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ; —তাহা হইলে আমাকে ধুমপান ত্যাগ করিতে হইল, কি জানি ভাই মরিয়া হুক্কা হুক্কা করিতে হয়।

স।—না তাহা হইবে কেন, আমি তখনও তামাক সাজিয়া দিয়া আসিব।

জ।—তা কি হয়,—তুমি দিতে গেলে আমি হয়ত তাড়া করিব, না হয় দে দৌড়।

স।—সে ভয় করিতে হইবে না, আমি দূরে রাখিয়া পলাইয়া আসিব।

জ।—না ভাই ঠাট্টার কথা নয়, আমি আর তামাক খাইব না।

স। এই ত তুমি রাগ করিলে ?

জ।—তবে কি আমার কথা মিথ্যা হইল ? সফুরা নীরব।

জহুরউদ্দিন বলিলেন,—তুমি মনে কিছু করিও না। আমি অনেক দিবস হইতেই ধুমপান ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়া আসিতেছি • কিন্তু

কি কারণে যে পারিতেছি না তাহা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া সফুরা বলিল,—তুমি বাঁদীর বে-আদবী ক্ষমা করিয়া ধূমপান ত্যাগ কর।

জহুরউদ্দিন প্রগাঢ় দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—তবে কি তুমিও ধূমপান মন্দ বাস?

স।—হাঁ ধূমপান করার প্রতি আমার ধিক্কার আছে।

জ।—(ঈষদ্ধাস্যে) কি বুঝিয়া? প্রত্যহ তামাক সাজিয়া দিতে হয় তাই নাকি?

স।—সে কাজে কি কোন দিন আমাকে বিরক্ত হইতে দেখিয়াছ?

জ।—না।

স।—তুমি যাহা খাও,—যাহা কর তাহাতে আমি রাজি আছি। খোদা না করুণ, কোন দিন যদি তোমার কোন কিছুতে বিরক্ত হই বা মুখ ভার করি, তাহা হইলে তখনই যেন আমার মাথায় অশনিপাত হয়।

জ।—যাক্ সে কথা,—তুমি ধূমপান মন্দ বাস কেন?

স।—আমার মেয়েলী বিবেচনায় মনে হয় ধূমপান করাটা যেন শরিওতের খেলাফ।

জ।—তাহাতে শরিওতের খেলাফ কি দেখ?

স।—আমি শুনিয়াছি, অনেক আলেম তামাককে নেশার জিনিষ বলিয়া ফতুয়া দেন। তামাক যদি প্রকৃতই নেশার জিনিষ হয় তাহা হইলে তাহার পানাহার করিরা গুণাহ্ (মহাপাপ) আর যদি তাহা না হয় তাহা হইলেও তামাক খাওয়া পরহেজগারের উচিৎ নয়।

জ।—(মুচকি হাসিয়া) মৌলবী সাহেবের ফতুয়া বেশ! আচ্ছা ধরিয়া লইলাম তামাক নেশারই বস্তু; কিন্তু তাহা ত চুষিয়া বা চিবাইয়া

খাওয়া হয় না। কেবল পোড়াইয়া ধূমপান করা হয় সেটা আর মন্দ কি ?

স।—তুমি ঠাট্টা কর আর যাহাই কর, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ধূমপান আরও মন্দ।

জ।—কি করিয়া ?

স।—খোদাতায়ালা আগুনে পোড়াইয়া পাপীদের শাস্তি করিবেন, তাই সকলেই আগুন হইতে খোদার নিকট পাণাহ্ (রক্ষা) চাহে, কিন্তু যাহারা তামাক খায় তাহারা সেই আগুনের ধূমই নাক মুখ দিয়া উদ্গীরণ করিয়া থাকে। আর সেই ধূমই কেমন নেশার জিনিষ ভস্মিত। তৌবা! আমার বোধ হয় যাহারা ধূমপান করে তাহারা দোজখের আগুন বলিয়া ভয় করে না। যদি ভয় করিত তাহা হইলে কাজে মুখে এক হইত।

জ।—বেশ! বেশ! খুবই ত বলিলে!

স।—আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি। ধূমপানের আর একটা খারাবী এই দেখা যায় পানি যেরূপ অমূল্য নিয়ামত, সেরূপ নিয়ামত দুনিয়াতে আর কিছু আছে কিনা বলিতে পারি না। যাহা অভাবে প্রায় কোন প্রাণীই বাঁচিতে পারে না, তামাক খোরেরা সেই অমূল্য নিয়ামত হুক্কায় পূরিয়া নাপাক করিয়া ফেলে। আর সেই নাপাকই কেমন যে যাহাতে লাগে তাহাকেই নাপাক করিয়া ফেলে। আর যদি মাটীতে পড়ে, তাহা হইলে ত তার দুর্গন্ধে দেশে টেকা ভার। আমি শুনিয়াছি খোদার কোন নিয়ামত অকারণ নষ্ট করিলে তাহার জবাবদেহী করিতে হইবে।

জ।—চলুক থামিলে কেন ?

স।—তামাক খোরির আরো একটা বেআদবী দেখ ইহাতে পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য, শ্বশুর জামাতা, ভদ্র ইতর, শাশুড়ী বধূ ইত্যাদি সকলেরই সমান

অধিকার ঐ দেখ পিতা হুকাটাতে দম করিয়া পুত্রের হাতে দিল পুত্রও সেই আলবলা সুন্দরীর সেই সুন্দর মুখে মুখ দিয়া দম কষিয়া "ফুউ" করিয়া ধুম ছাড়িয়া বৃদ্ধ পিতার পাকা দাড়িতে কুয়াশার সৃষ্টি করিয়া দিল। কতবড় বেআদবী এটা ? আর একটা কথা মনে হইলে আমার বড় হাসি পায়—যখন উপরে মুখ তুলিয়া "ফু—ফু" করিয়া ধূমোদ্গীরণ করে। এই বলিয়া একটু হাসিল।

জ।—থামিয়া গেলে যে ? চলুক।

স।—আমি শুনিয়াছি ধুম পানে যেমন অর্থের ক্ষতি তদ্রূপ স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। একদিন বাবাজান বলিতেছিলেন "বিদেশীরা আমাদের দেশে বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি আমদানী করিয়া বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া যাইতেছে।" দেখ ত এই সকল টাকা থাকিলে দেশের কত উপকার হইত ? একদিন ভাইজানও বলিতেছিলেন "আজকাল বিড়ি সিগারেটের এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে হাট বাজার ও রেলের গাড়ীতে টেকা যায় না।" বিশেষতঃ তামাক খোরদের মুখে যে প্রকার দুঃ······। এই বলিয়া দাঁতে জিব কাটিল।

জ।—তা সত্য তামাক খোরদের মুখ দুর্গন্ধ হয়।

স।—বাঁদীর অপরাধ ক্ষমা কর, আজি বড়ই বেআদবী করিলাম।

জ।—না এ বেআদবীর ক্ষমা টমা নাই। এই বলিয়া একটু হাসিয়া আবার বলিলেন ;—তুমি বেআদবী করিলে না আমাকে ধন্য করিলে ?

স।—তুমি কিসে ধন্য হইলে ?

জ।—তুমি ধূমপানের বিষয় যে সকল কথা বলিলে আমিও সে সকল বুঝিয়াছি ; কিন্তু বুঝিয়াও এতদিন তাহা ত্যাগ করিতে পারি নাই। তবে অদ্য তোমার মিষ্ট উপদেশে আমার চৈতন্য সম্পাদন হইল। এই আমি তৌবা করিলাম : জীবনে আর কখনও ধূমপান করিব না।

সফুরা ভক্তি গদ গদ হৃদয়ে বলিল—আজি আমিও ধন্য হইলাম। এই বলিয়া স্বামীর করদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক চুম্বন করিল।

জ।—তুমি আবার ধন্য হইলে কিসে?

স।—অদ্য আমার দোওয়া কবুল হইল বলিয়া।

জ।—বুঝিলাম না।

স।—তোমার তামাক খাওয়া ছাড়ার জন্য আমি খোদার নিকট দোওয়া করিতাম, অদ্য তাহা কবুল হইল।

জ।—যাক সে কথা; কিন্তু তুমি পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছ তাহার নিমিত্ত তৌবা কর, সেরূপ কথা আর কখনও বলিও না।

স।—কি কথা, আমার ত মনে হয় না।

জ।—ঐ যে বলিয়াছ—যাহারা তামাক খায় তাহারা মরিয়া শিয়াল হইয়া হুক্কা হুক্কা করে। এইরূপ কথা বলা ও বিশ্বাস করা মহাপাপ।

স।—আমি তাহা বিশ্বাস করি না কেবল রহস্য করিয়া বলিয়াছি।

জ।—রহস্য করিয়া বলাও পাপ, কেননা তাহাতে পুনর্জ্জন্ম প্রমাণের গন্ধ আছে।

স।—কিরূপ পুনর্জন্ম?

জ।—হিন্দুরা বলে যে মানুষ মরিবামাত্রই আবার জন্মগ্রহণ করে। তবে যদি সে পুণ্যবান হইয়া মরে তাহা হইলে পুনর্ব্বার মানুষ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, আর যদি পাপ করিয়া মরে তাহা হইলে কোন নিকৃষ্ট প্রাণী হইয়া জন্ম লইয়া থাকে; কিন্তু আমাদের ধর্ম্মে সেরূপ কথা নাই।

সফুরার হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। সে ভয়ে ভীত হরিণীর ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল সত্য নাকি?

জ। হাঁ সত্য। পুনর্জন্ম বিশ্বাস করা মহাপাপ এবং সে পাপীর স্থান জাহান্নামে।

স।—আমি তৌবা করিলাম সেরূপ কথা আর কোন দিন রহস্য করিয়াও বলিব না; কিন্তু আর কিসে কিসে মহাপাপ হয়, তাহা আমাকে বল।

জ।—তোমাকে সে সকল কথা শুনান আমার একান্ত কর্ত্তব্য; কিন্তু অদ্য পারিলাম না, তবে লক্ষ্মীপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সকল কাজ ফেলিয়া আগে তোমাকে শোনাইব। আর সময় নাই কথায় কথায় বিলম্ব হইয়া গেল, এখন না গেলে ট্রেণ ধরা যাইবে না। তবে আসি। এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সফুরা খাতুনের মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিল। সে নয়ন ভরা সলিল লইয়া ধরাগলার ভরা আওয়াজে বলিল—"কখন আসিবে?"

নিশীথ কালে নির্জ্জন ঘরে যাত্রার সময় যিনি প্রিয়তমার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াছেন, তিনি সফুরা খাতুনের এই কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। স্ত্রীর এই আব্দার পূর্ণ বাক্যে জহুর উদ্দীনের মন যে কেমন হইয়া উঠিল, তাহা বোধ হয় তিনি নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; কিন্তু লক্ষ্মীপুর না গেলেও চলিবে না তাই তিনি হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক মুখে প্রফুল্লতা দেখাইয়া বলিলেন,—"চিন্তা কি খোদা চাহে কালকেই ফিরিব।" এই বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সফুরাও পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং জহুর উদ্দিন বহির্ব্বাটীতে আসিয়া যখন গাড়ীতে উঠিলেন তখন সে ফিরিয়া গিয়া শয়ন শয্যায় পড়িয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

জহুর উদ্দিন ও আবদুল মতিন বিশ্বাসের কারবার আরম্ভ হইবার পর দুইটী বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই বৎসরদ্বয়ে তাহাদের কারবারে যথেষ্ট আয় হইয়াছে। সেই আয় হইতে আবদুল মতিন বিশ্বাস মাড়োয়ারীর দেনা শোধ করিয়া বাগান ফিরাইয়া লইয়াছেন।

উল্লিখিত সময় মধ্যে আমাদের বর্ণিত দম্পতি যুগলের সুখময় জীবনে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমরা সে সকল ঘটনার কথা অবগত হইয়াও বাহুল্য ভয়ে লিখিতে সাহস পাইলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, সফুরা এখন আপন্ন সত্ত্বা।

সফুরার সাতমাসের গর্ভ ধারণের সময় একদিন বৈকাল বেলা জহুরউদ্দিন একখানা পত্র হস্তে লইয়া হাসিতে হাসিতে স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন,— সফুরা "মিঠাই চাই"। সফুরাও বিম্বাধর ঈষৎ বিকম্পিত করিয়া বলিল, "কিসের মিঠাই ?"

জ।—খোস খবরের।

স।—কিসের খোস খবর ?

জ।—(হাতের পত্রখানা দেখাইয়া) এই দেখ নেদার খবর।—এই বলিয়া দাঁতে জিব কাটিলেন।

স।—কোন একটা কথা পড়িলে কোন দিনই তুমি সোজাভাবে বলিবে না। খবরটা কি খুলে বল না কেন ?

জ—ভাই সাহেব (আবদুল মতিন) পত্র লিখিয়াছেন সম্ভবতঃ আজ

কি কাল তোমাকে লইয়া যাইবার জন্ত তিনি সশরীরে এ গরীবালয়ে পদার্পণ করিবেন।

স।—বেশ ত মন্দ কি ?

জ।—তা মন্দ হবে কেন—তুমি ত গাড়ীতে উঠিয়া ডং ডং করিয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু এদিকে যে একজনের প্রাণ শুকাইয়া ......।

স।—চোঁ চোঁ করিয়া দু' গেলাস পানি খাইলেই চলিবে।

জ।—তুমি যাই বল ; কিন্তু আমার খুবই রাগ ধরিয়াছে ইচ্ছা হয় তোমাকে ধরিয়া মা......

স।—কি দিয়া মারিবে—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীর গলায় ধরিয়া বলিল, "লও যেথানে ইচ্ছা মার।" জহুর উদ্দিন স্ত্রীর চিবুক ধারণ পুর্ব্বক মুখখানা উপরে তুলিয়া বলিলেন, "কি দিয়া মারিব তোমাকে চাঁদ-বদনী আমার !"

অতঃপর এক পশলা হাস্যবৃষ্টি পাত হইলে পর জহুর উদ্দিন বলিলেন,—আচ্ছা বল দেখি স্ত্রী স্বামীর নিকট মার খায় কেন ?

স। স্বামী মারে বলিয়াই মার খায়।

জ।—স্বামীরা কি এমনিই ধরিয়া মারে ?

স।—স্ত্রীরা কি ইচ্ছা করিয়া পিঠ পাতিয়া দিতে যায় ?

জ।—এটা বোধ হয় বিচারের কথা হইল না।

স।—তবে এইবার শুন বিচারের কথা বলিতেছি—যে স্ত্রীর স্ত্রীত্ব নাই সেই স্ত্রীরা মার খায়। আর যাহাদের স্ত্রীত্ব আছে তাহারা কখন স্বামীর মার খায় না। মার ত দূরের কথা চক্ষু রাঙ্গান পর্যন্ত দেখিতে পায় না।

জ।—স্ত্রীর স্ত্রীত্ব কিরূপ ?

স।—তাহা অনেক প্রকার, কিন্তু মার না খাওয়া স্ত্রীত্ব যাহাতে স্বামীর

ক্রোধ জন্মে এরূপ কোন কার্য্য স্ত্রী কখন করিবে না অথবা তদ্রূপ কোন কথা কখন রসনাগ্রে আনিবে না।

জ।—তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু মানুষ হইতেই ত ভুল ভ্রান্তি হইয়া থাকে।

স।—বেশ, তাই যেন হইল তাই বলিয়া কি মার খাইতে হইবে?

জ।—খাইবে বৈ কি—তিনি ক্ষমা না করিলে নিশ্চয় মার খাইবে।

স।—না কখনই না—ক্ষমা করাইয়া লইতে হইবে।

জ।—তর্কস্থলে ধরিয়া লও আমি ক্ষমা করিলাম না।

স।—বেশত তুমি ক্ষমা করিলে না, রাগে একটা মানুষ দশটা হইয়া একগাছি সাড়ে সাত হাতের লাঠি লইয়া কুদিয়া ফাঁদিয়া আমাকে মারিতে আসিলে, আর আমি সে সময় লজ্জা, ভয়, রাগ, অভিমান ইত্যাদি কিছু না করিয়া অথবা গালির চোটে তোমার পূর্ব্বপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার না করিয়া স্বীয় অস্ত্র খুলিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলাম। এখন এস কর মোকাবেলা।

জ। তুমি আবার কি অস্ত্র খুলিলে?

স।—আমার অস্ত্র দেখ নাই?—গাল ভরা হাসি।

জ।—পাগ্‌লি! সে অস্ত্রে কি যুদ্ধ করা চলে? আর সে সময় তাহা ব্যবহারই বা করিবে কি করিয়া?

স।—সে অস্ত্রের মত অস্ত্রই নাই। ব্যবহার প্রণালী জাননা এই দেখ তোমাকে দেখাই—তুমি যেমন মারিতে আসিলে আমি অমনি হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া তোমার গলাধারণ পূর্ব্বক চুম্বনের জন্য রাঙ্গা টুকটুকে গাল পাতিয়া দিলাম। এখন বল তুমি আমাকে মারিবে না সোহাগ করিয়া বুকে টানিয়া লইবে?

জ।—(ঈষদ্ধাস্যে) সকলেই কি এরূপ করিতে পারে?

স।—(স্ফীতবক্ষে) যাহারা করিতে অক্ষম তাহারা কাজেই মার খাইবে।

জহুর উদ্দিন স্ত্রীর কপোলদ্বয় টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন—তুমি মানবী না বেহেস্তের হুর!

স।—মনবী নই মানবীর বাঁদী।

জ।—"গাইত যদ্যপি শশি গুণ আপনার
হত কি তা হলে এত প্রিয় সবাকার।"

স।—অত প্রশংসা করিয়া আকাশে তুলিলে চলে? আচ্ছা আমি যে কথা বলিলাম তাহাই কি তুমি ঠিক বলিয়া মানিয়া লইলে।

জ।—কেন, না মানিবার কি আছে?

স।—আমি যাহা বলিলাম তাহা কেবল স্বামীর অবৈধ অত্যাচার হইতে স্ত্রীর আত্মরক্ষার জন্যই বলিলাম; কিন্তু যদি বিচারের কথা বলি, তাহা হইলে স্ত্রীকে মারিতে স্বামীর কোন অধিকার নাই।

জ।—তুমি তাহা কি করিয়া জানিলে?

স।—আমি পড়িবার সময় একদিন মৌলবী সাহেবের মুখে শুনিয়াছিলাম —হাদিসের কথা,—তিনি বলিতেছিলেন,—স্ত্রীকে মারিতে স্বামীর কোন অধিকার নাই। স্ত্রী যদি ধর্ম্ম বা সাংসারিক বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটী বা অপরাধ করে তাহা হইলে স্বামী তাহাকে নরম গরম যেভাবেই পারে বুঝাইবে, তবে যদি একান্তই না বুঝে, তাহা হইলে অগত্যা তাহাকে তালাক দিতে পারে; কিন্তু হালের বলদের ন্যায় মারিতে পারিবে না।

জ।—মৌলবী সাহেবের কথা সত্য; কিন্তু মানব জাতির কলঙ্ক বলিয়া আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর জীব আছে। তাহারা মনে করে স্ত্রী যেন তাহাদের বাবার দত্ত বস্ত মৌরশী সম্পত্তি। মূর্খরা যদি জানিত যে, স্ত্রীর

দেহের লভ্যাংশ ব্যতীত তাহাতে তাহাদের আর কোন অধিকার নাই। তাহা হইলে দাম্পত্য জীবন কি সুখের ও মধুময় হইত। সে দিবস খবরের কাগজে পড়িলাম পূর্ব্ববঙ্গের কে তাহার স্ত্রীর নিকট কি খাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু হতভাগিনী তাহা দিতে পারে নাই বলিয়া সেই পাপাত্মা স্বামী বেচারিকে কুঠার দ্বারা চোটাইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় করিয়াছে। উহুঃ! কি নির্দ্দয়!

স।—এই দেখ আমার শরীর কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে। তুমি অমন কথা আর আমাকে শোনাইও না। তবে তোমার রাগ হইল কেন তাহা বল, যে জন্য মারিবার কথা উঠিল।

জ।—তুমি আমাকে একেলাটী ফেলিয়া যাইবে কেন?

স।—এর পূর্ব্বেও ত কতবার গিয়াছি কই তাহাতে ত তুমি কিছু বল নাই।

জ।—তাই দোষ নাকি? সে যে খুব জোর সপ্তাহ দুই সপ্তাহের জন্য এবার যে মাস ছ'মাস।

স।—তা কেন—এবারও সেইরূপই হইবে।

জ।—তাহা যে দেশের প্রথা নয়।

স।—নাই বা হইল দেশের প্রথা। তুমি যাহাই বল; কিন্তু এবার আমি লক্ষ্মীপুর যাইব না।

জ।—(মুচকি হাসিয়া) কেন রাগ করিলে নাকি?

স।—রাগ করি নাই তবে জানিনা কেন এবার সেখানে যাইতে আমার মন এগোয় না। সেখানে যাইবার কথা মনে হইলেই কেন কলিজা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

জ।—না গেলেত ভালই হয়, অভাগার বুক ভরিয়া থাকে; কিন্তু না গেলে লোকে কি বলিবে!

স।—লোকে আবার বলিবে কি, আমার মন আমি যাইব না তাহাতে লোকের কি আসে যায়।

জ।—তুমি যাহাই বল কিন্তু ······

তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন এই সময় বাটীর চাকরাণী ফয়েজানের মা আসিয়া বলিল "লক্ষ্মীপুর হইতে গাড়ী আসিয়াছে।" শ্রবণমাত্রই সফুরার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। জহুর উদ্দিন বহির্ব্বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন।

ষটত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য জহুর উদ্দিনের বাটীতে ভোজের বেশ সমারোহ। আবদুল মতিন বিশ্বাস ভাগ্নকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সশরীরে কামডোল আসিয়াছেন বিধায় খাওয়ার আয়োজনটা রীতিমতই হইতেছে, কিন্তু যাহাকে লইয়া যাওয়া উপলক্ষে এত ধুমধাম এত আয়োজন এত আমোদ অদ্য তাহার মুখে সুখ শান্তির লেশমাত্র নাই, অদ্য তাহার সুন্দর মুখখনি বিষণ্ণ—মনটী উদাস।

মার বাড়ী আনন্দ পুরী, শ্বশুর বাড়ী কএদ বাড়ী। এই কএদ বাড়ী হইতে আনন্দপুরি যাইতে কোন মেয়ে নারাজ? মার বাড়ী যাইবার আনন্দ সংবাদ পাইলে কোন মেয়েটীই না সশরীরে নাচিয়া উঠে? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই মেয়েরা যে ক'দিন শ্বশুরালয়ে থাকে সে ক'দিন পিঞ্জিরাবদ্ধ বিহঙ্গমার ন্যায় অথবা জেলখানার কএদির ন্যায় বাস করিতে থাকে। দিন রাত্রিতে শত শতবার দিন গণিয়া পোড়া সময়টাকে সাধ্য পক্ষে পাছে ঠেলিয়া—একখানা পা আগে বাড়াইয়া কোন মেয়েই না মার বাড়ী যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে? যখনই মার বাড়ীর সেই সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ী—সাজান গোছান জিনিষ পত্র—সেই তাল, বেল, নারিকেল লেবু, আনারস, জাম, কাঠাল ইত্যাদি বৃক্ষের মনোহর শোভা—সেই আম্র বৃক্ষের সুশীতল ছায়া মার বাড়ী—সেই স্বাধীনতা সেই মুক্ত আকাশের নীচে এলোকেশে স্ফীত বক্ষে পাড়া ভ্রমণ সেই ক্রীড়ার পুতুল সেই বাল্য-সহচরি খেলার সঙ্গিণিগণ—সেই আনন্দ কোলাহল—সেই আবদার—স্নেহ স্নেহ ইত্যাদির কথা যখন মনে পড়ে তখন কোন মেয়েরই না মন ফুলিয়া ফাঁফিয়া

উঠে? কোন মেয়েই না ছুটিয়া মার বাড়ী যাইবার ইচ্ছা করে? কিন্তু লিখক! তোমার নায়িকার স্বভাব দেখিতেছি মেয়ে শাস্ত্রের বিপরীত ইহাও কি সম্ভব? যদি আমাদের কোন পাঠক পাঠিকা এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বসেন তাহা হইলে আমরা তাহার সন্তোষজনক কি কৈফিয়ৎ দিব? কেননা মানুষের মনের কথা বলিবার অধিকার কোন মানুষেরই নাই, বিশেষতঃ পুরুষ হইয়া অপর স্ত্রীর গম্ভীর মনের কথা বাহির করা সহজ কথা নয়। তবে যদি কিছু বলিতে হয় তাহা হইলে অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু আমরা সে আশ্রয়ও লইতে পারিলাম না কেননা সকল স্থানে অনুমান করিয়া কিছু বলাও পাপ। তবে যদি ঘটনাক্রমে আমাদের নায়িকার মার বাড়ী যাইবার অনিচ্ছার কারণ বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে প্রিয় পাঠক পাঠিকা সেখানেই সে প্রশ্নের উত্তর পাইবেন।

আবদুল মতিন বিশ্বাস কামডোল আসিবার পর দুইদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় দিবসে তিনি বাটী যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া জহুর উদ্দিনকে তাকিদ করিলেন। জহুর উদ্দিন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহার সহধর্ম্মিনী পরিশুষ্ক মুখে শয়ন খট্টায় পড়িয়া কি যেন চিন্তা করিতেছে। তিনি স্ত্রীর নিকট যাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোমার ভাই বাটী যাইবার জন্য বাহিরে কুঁদা ফাঁদা করিতেছেন আর তুমি নিশ্চিন্ত ভাবে শুয়ে আছ যে?"

স।—শুয়ে থাকিব না ত কি করিব?

জ।—কেন—যাইবে না?

স।—না।

জ।—বল কি! নাগেলে হয়—স্বয়ং ভাই সাহেব না হইলেও হইত।

স।—তুমি তাহাকে যাইয়া বল—সে যাইবে না।

জ।—সে কথা বলিতে আমার সাহস হইবে না।

স।—সোজাভাবে বলিতে না পার কোন একটা ওজর জানাইয়া বল—আজি যাওয়া হইবে না আর এক দিন আসিবেন।

জ।—তাহাও আমি বলিতে পারিব না। বলিতে হয় তুমি নিজেই যাইয়া বল না হয় কাপড় চোপড় লও। তিনি আর বিলম্ব করিতে চাহেন না।

সফুরা আর কোন কথা না বলিয়া সজল নয়নে উঠিয়া বসিল এবং বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নয়নদ্বয় হইতে সমীর-সঞ্চালীত বর্ষার নীল পদ্ম হইতে বারিপাতের ন্যায় দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া গণ্ডদ্বয় চুম্বন করিল। স্ত্রীর চক্ষে জল দেখিয়া জহুর উদ্দিনও নয়ননীর থামিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি সাশ্রুলোচনে স্ত্রীর নয়নবারী মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন,—"প্রিয়তমে! এ অভাগার হৃদয়ে আর ব্যথা দিও না।"

সফুরা রোদন রোধ করিয়া স্বামীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল,—বাঁদীর অপরাধ ক্ষমা কর, তোমার মনে আর কষ্ট দিব না। আমি যাইতেছি; কিন্তু…।" এই কথা বলিয়া নয়ন ভরা সলিল লইয়া স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল।

জহুর উদ্দিন স্নেহ ভরে স্ত্রীকে বুকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—"বলিতে বলিতে থামিলে কেন? কি বলিতেছিলে বল।"

সফুরা বলিল,—"আমি যতবার সেখানে গিয়াছি ততবারই বেশ আনন্দের সঙ্গে গিয়াছি; কিন্তু এবার সেখানে যাইতে মোটেই মন এগোয় না। সেখানে যাইবার কথা মনে হইলেই যেন বুকের উপর দিয়া কি হাটিয়া যাইতেছে। খোদা জানেন কপালে …।" এই বলিয়া আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

জহুর উদ্দিন বলিলেন,—"ছিঃ! অমন কথা বলিতে বা মনে করিতে নাই। খোদা আছেন। লও তুমি গহনা, কাপড় যাহা লইবে লইয়া বাহির হও।"

সফুরা বলিল ;—"আমি কিছুই লইব না যাহা পরিয়া আছি তাহাই লইয়া যাইব—সেখানে গহণা কাপড় পরিয়া দেখাইব কাহাকে ? তুমি দোওয়া কর খোদা সহি সালামতে ফিরাইয়া আনিলে এখানে আসিয়া পরিব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া স্বামীর হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বলিল ;—"মানুষের জীবন মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

জহুর উদ্দিন বলিলেন ;—"পাগলি ! তোমাকে ক্ষমা করিবার আমার কি আছে ?" সফুরা সলিল ভরা নয়নে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল ; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া জহুর উদ্দিন বলিলেন,—"তোমাকে ক্ষমা করিলাম ; কিন্তু তুমি ··· ? সফুরা সেই সলিল ভরা নয়নে আবার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিল।

তাহাদের এই পর্য্যন্ত কথা বলা হইয়াছে এমন সময় সফুরার শ্বাশুড়ী আসিয়া বলিলেন,—"মা, ছেলেটা বাহিরে অপেক্ষা করতেছে—বেলাও অনেক হয়ে পড়ল, সকালে বাহির হয়ে এস।" সফুরা বলিল,—"এই আসি।" তাহার শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন।

এদিকে জহুর উদ্দিন স্ত্রীকে বলিলেন,—"তবে আর বিলম্ব কি ?" সফুরা বলিল,—"একটু আছে।" এই বলিয়া নিজের কোরআন শরিফখানা লইয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার বাঁধিয়া রাখিল। অতঃপর স্বীয় ট্রাঙ্ক হইতে এক খানা দলিল বাহির করিয়া স্বামীকে বলিল,—"তুমি মোহরাণা দরুণ যে ৪৫ বিঘা জমির কাবিননামা লিখিয়া দিয়াছিলে তাহা আমি তোমাকে 'হেবা' করিলাম।" এই বলিয়া একটা প্রদীপ ধরাইয়া হাতের দলিলখানা পোড়াইয়া ফেলিল।

জহুর উদ্দিন নীরবে স্ত্রীর কার্য্য দেখিতেছিলেন। সফুরা আবার বলিল "এস এখন একবার 'মোসাফা' করিয়া বিদায় হই।" এই বলিয়া পতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল,—"সব থাকিল দেখিও এবং মধ্যে মধ্যে যাইয়া

দেখা করিয়া আসিও।" জহুর উদ্দিন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সফুরা "তবে এখন আসি—আস্‌সালামো ওআলাইকুম।" এই বলিয়া তাহার সাজান গোছান আসবাব পত্রের প্রতি চাহিতে চাহিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার শ্বাশুড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। সে শ্বাশুড়ীর নিকট আসিয়া সালাম জানাইয়া দোওয়া চাহিল বৃদ্ধা প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। গাড়ীখানা দক্ষিণ মুখে ছুটিয়া চলিল।

জহুর উদ্দিন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের প্রান্ত ভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া ভগ্ন হৃদয়ে বাটী ফিরিলেন। সে সময় তাহার চক্ষের সামনে দুনিয়াটা উদাস উদাস দেখাইতেছিল এবং চক্ষুর্দ্বয় পুরিয়া জলও আসিয়াছিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সফুরা লক্ষ্মীপুর যাওয়ার পর পঁচিশ দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। জহুর উদ্দিন সাংসারীক নানা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত থাকায় এতদিন ধরিয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ২৬ দিবসের দিন তিনি আবদুল মতিন বিশ্বাসের লিখিত একখানা পত্র পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল, "বর্ত্তমান বন্ধের সূতা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আপনি দুই এক দিবসের মধ্যে আসিয়া হিসাব বুঝিয়া যাইবেন।"

তিনি এই পত্র পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎপর দিবস লক্ষ্মীপুর যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন এবং পর দিবস ফজরের নামাজ পড়িয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ পূর্ব্বক বাটী হইতে বাহির হইলেন।

তিনি সবেমাত্র রাস্তায় পা দিয়াছেন এমন সময় গ্রামের তিনজন লোক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বিনয় পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"আমরা অদ্য কএক দিবস হইতে পুকুরিয়া মহাজনের বাড়ী যাইয়া যাইয়া থাকিয়া গেলাম; কিন্তু আপনি না গেলে কোন মতেই টাকা কর্জ্জ দিতে চাহে না। এ আপনি মেহের্ব্বানী না করিলে আমাদের আর কোন উপায় নাই।" জহুর উদ্দিন বলিল,—"তবে কেমন হইল আমি ত লক্ষ্মীপুর যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি।" কিন্তু লোকত্রয় তাহাকে কোন মতেই ছাড়িল না বিধায় অগত্যা তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা চল তোমাদের কার্য্য শেষ করিয়া ঐ পথেই চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া পুকুরিয়া চলিলেন।

বেলা এগারটার সময় তিনি পুকুরিয়া কার্য্য শেষ করিয়া সঙ্গিগণকে

বলিলেন,—“এখন তোমরা বাটী যাইতে পার আমি লক্ষ্মপুর চলিলাম।” তাহার এই কথা শুনিয়া জনৈক লোক বলিল,—“এই ভরা দ্বিপ্রহরে রৌদ্র মাথায় করিয়া ৭।৮ ক্রোশ রাস্তা কেমন করিয়া যাইবেন ?” জহুর উদ্দিন বলিলেন— “রৌদ্র দেখিয়া কি করিব বিশেষ কাজ আছে না গেলে চলিবে না।” এই বলিয়া পূর্ব্ব মুখে লক্ষ্মীপুরের পথ ধরিলেন।

ভরা দ্বিপ্রহর। তপন-তাপনে দিঙ্মণ্ডল ধূধূ করিতেছে। এই অনলবর্ষী রৌদ্র মাথায় করিয়া জহুর উদ্দিন ছুটিয়া চলিয়াছেন। কোন দিকে দৃষ্টি নাই কারু সঙ্গে কথা নাই কোন স্থানে বিশ্রাম নাই কেবল আশা কতক্ষণে একবার সেই মুখখানি দেখিবেন। আশা কুহকিণীর এই মোহন মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন বিধায় তাহাকে রৌদ্র লাগিবে কেন ? তিনি এইরূপে প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিশ্রাম হেতু একটা আম্র বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন।

তিনি বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত যে আম্র বৃক্ষটীর ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন সে বৃক্ষটী একখানা মুদিখানা দোকানের সম্মুখে ছিল। বৃক্ষটী হইতে দোকানখানা অধিক দূর ছিল না এমন কি বৃক্ষটীর দুই একটী শাখার অগ্রভাগ দোকান ঘরের উপরে যাইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বিশ্রাম হেতু সবে মাত্র বসিয়াছেন এমন সময় “জয় হউক” বলিয়া জনৈক বৈষ্ণব বাবাজি আসিয়া উল্লিখিত দোকান ঘরের বারাণ্ডায় উঠিল। বাবাজী পরণে গেরুয়া বসন, গায়ে নামাবলী, ললাট, বাহু ইত্যাদিতে বাঘ থাবা তিলক। বিকচ মস্তকে অর্দ্ধ হাত পরিমাণ গিরা বাঁধা টিকি! হাতে একটা বাদ্য যন্ত্র। বাবাজি আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বাদ্যযন্ত্রটীর কাণ মলিয়া গান ধরিল। বাবাজি গাহিল :—

“শব হয়েছি ভাসি জীবনে
(ও) জীবন বিনে।

যবে দেহে ছিল প্রাণ ছিলাম প্রাণ প্রিয়সির প্রাণ
কাছে বসে হেসে হেসে খেতে দিত পান
এবে সেই বা কোথা আমিবা কোথা
পৃথক হলেম দুই জনে।
যবে দেহে ছিল প্রাণ ছিলাম সামান্য মানীমান
ধনিন কুলিন মানিন ছিলাম
বিদ্যা বুদ্ধিমান
এবে সে সব দশা জলে ভাসা
চিনবে আমায় কোন গুণে
বা চিনবে আমায় কোন জনে ?

(৩) সব বন্ধুগণ মিলে জলে দিলে গো ফেলে
সেই অবধি ভাসি আমি এ গঙ্গার জলে।
(হরিহে !) মাএর কোলে জলে উঠব ফুলে
খাবে চিলে শগুণে।"

বাবাজির গানে জহুর উদ্দিন মস্তক তুলিয়া তাহার প্রতি চাহিতে প্রথমে যাহা দেখিলেন তাহাতে না হাসিয়া পারিলেন না। বাবাজি চক্ষু মুদিয়া মাথা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া গান ধরিয়াছে গানের ঝোঁকে তাহার বিকচ মস্তকের সেই অর্দ্ধ হাত পরিমাণ গিরা বাঁধা টিকিটা কি সুন্দর লাফ কাফ খেলিতেছে, কিন্তু গানের মর্ম্মে তাহার মনটা যেন কি এক রকম হইয়া উঠিল ; তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"হায়রে দুনিয়া !"

জহুর উদ্দিন মনে করিয়াছিলেন, একটু বিশ্রামের পর সেই দোকান হইতে কিছু খাবার লইয়া জলযোগ করিবেন তৎপর জোহরের নামাজ পড়িয়া লক্ষ্মীপুরের পথ ধরিবেন, কিন্তু তাহা আর হইল না। বাবাজির গানে মন

খারাপ হইয়া উঠায় তাহার ক্ষুৎপিপাসা যেন সরিয়া গেল। তিনি জোহরের নামাজ পড়িয়া লক্ষ্মীপুরের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দিনমণি অস্ত চলে যায় যায়। এই সময় জহুর উদ্দিন লক্ষ্মীপুর যাইয়া পৌঁছিলেন। তিনি আবদুল মতিন বিশ্বাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বহির্ব্বাটীতে আসন গ্রহণ করিতেই তাহার ছোটা শালিকা রাহেলা খাতুন তাহাকে দর্শন মাত্রই তাহার কাপড় চোপড় ধরিয়া টানিতে টানিতে বাটীর মধ্যে লইয়া গেল।

সফুরা আসিবার সময় স্বামীকে বলিয়া আসিয়াছিল,—"মধ্যে মধ্যে যাইয়া দেখা দিয়া আসিও।" কিন্তু প্রায় মাসেক কাল অতীত হইতেছে তবুও তিনি তাহাকে দেখা দিতে আসে নাই বিধায় সে স্বামীর প্রতি মনে মনে অভিমান করিয়াছে,—"এবার আসিলে সহজে দেখা দিব না।" কিন্তু যখন সে শুনিতে পাইল তাহার স্বামী বহির্ব্বাটীতে আসিয়াছেন। এই বার্ত্তা শ্রবণ মাত্রই সে যেন হাতে স্বর্গ পাইল। আর কি অমনি তাড়াতাড়ি এমন স্থানে যাইয়া দাঁড়াইল যাহাতে স্বামী বাটীতে আসিবামাত্রই যেন সে প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় এবং তিনি যেন কোনক্রমেই তাহাকে দেখিতে না পান।

রাহেলা খাতুন জহুর উদ্দিনের কাপড় ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই সর্ব্বাগ্রে সফুরার দৃষ্টি তাহার মুখ মণ্ডলে পতিত হইল; কিন্তু হায়! পথশ্রান্ত পতির ঘর্ম্মাক্ত পাণ্ডুর মুখখানা দর্শন মাত্রই তাহার অভিমান আর তাহাকে জ্বালাতন করিতে সাহস পাইল না। তাহার প্রফুল্ল মুখখানি মলিন ও নয়নদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। সে মনে করিল—"পতি আমার—দৌড়িয়া যাইয়া তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইনা কেন?" কিন্তু মারবাড়ী থাকিয়া কোন্ রমণী সেরূপ ভাবে পতি আসিবামাত্রই তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে? বিশেষতঃ সে আপন্ন সত্বা। লোক লজ্জা ত আছে—হায়রে লোক লজ্জা!

সে যাহা হউক সফুরা পতির শুশ্রূষার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে না পারিলেও তাহার শুশ্রূষায় কোন প্রকার ক্রুটী হইল না। অতঃপর রাত্রি অধিক হইলে জহুর উদ্দিন নৈশাহার ও নামাজ সমাপনান্তর ভিতর বাটীর দক্ষিণ দ্বারি ঘরের বারাণ্ডায় শয়ন করিলেন; কিন্তু তাহার মনে শান্তি নাই কেননা তিনি যে মুখখানি দেখিবার জন্য রৌদ্র মাথায় করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছেন কই এ পর্য্যন্ত ত সে মুখখানির দর্শন ঘটিল না! সে যে কতক্ষণে আসিয়া একবার দেখা করে!

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পর দিবস ফজরের নামাজ পড়িয়া আবদুল মতিন বিশ্বাস ও জহুর উদ্দিন আহাম্মদ কারবারের খাতা বহি লইয়া আয় ব্যয় ইত্যাদির হিসাব বুঝিতে বসিলেন, কিন্তু এই হিসাব বুঝিতে সামান্য একটা কথা লইয়া তাহাদের মধ্যে হাতাহাতি মুখামুখি না হইলেও মনে মনে একটু হইয়া গেল। সে যাহা হউক সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই তাহাদের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। জহুর উদ্দিনের মনের গতি বড় ভাল নাই বিধায় তিনি বিশেষ একটা কার্য্যের বাহনা করিয়া তখনই বাটী যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখের সামনে অন্ধকার রাত্রি বলিয়া আবদুল মতিন বিশ্বাস অনেক বাধা দিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। তিনি তখনই ছাতা, জুতা, কাপড় চোপড় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

জহুর উদ্দিন ষ্টেশনে যাইবার নিমিত্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছেন ইতোমধ্যে একটী বালিকা দ্রুতপদে পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাহার পরিধান বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বলিল, "তুমি ফিরে চল।" জহুর উদ্দিন পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইলেন বালিকাটী তাহারই কনিষ্ঠ শালিকা রাহেলা খাতুন। তিনি সহাস্যে বালিকার চিবুক ধরিয়া বলিলেন,—"না আজি আর ফিরিব না আর একদিন আসিব।"

বালিকা আবদার পূর্ণ বাক্যে বলিল,—"না তুমি এখনই চল।" এই বলিয়া কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। জহুর উদ্দিন বলিলেন,—"অমন টানাটানি করিও না কথা শুন আজি ছাড়িয়া দাও নিশ্চয় আর একদিন

আসিব।" বালিকা কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নহে সে কাপড় ধরিয়া আরও বেগে টানিতে লাগিল এবং এই সময় তাহার নয়নদ্বয় হীমানী পরিশোভিত নীল পদ্মের ন্যায় ছলছল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "না তুমি এখনই চল, তুমি না কহিয়া সাঝের বেলা চলিয়া যাইতেছ তাই বুবুজান কাঁদিতেছে—মাজান বলিল তাঁকে ফিরাইয়া আন।" এই বলিয়া বাটীর দিকে টানিতে লাগিল। জহুর উদ্দিন কি যেন বুঝিয়া আর কোন আপত্তি না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

বালিকা জহুর উদ্দিনের কাপড় ধরিয়া বরাবর বাটী আসিয়া দক্ষিণদ্বারি ঘরে প্রবেশ করিল। এই সময় জহুর উদ্দিনের শ্বাশুড়ী আসিয়া আঙ্গিনা হইতে বলিলেন,—"বাবা তুমি অমন করিয়া যাইতেছিলে কেন? হায় আল্লা! মুখের সামনে যে আঁধার রাত—এমন সময় কি যাইতে আছে? তবে যদি একান্ত যাইবে সকালে যাইও।" জহুর উদ্দিন—"বিশেষ কাজ ছিল" বলিয়া সেই দক্ষিণদ্বারি ঘরে আসন গ্রহণ করিলেন।

তিনি যে ঘরখানায় আসন গ্রহণ করিলেন সেই ঘরেই তাহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী সফুরা দাঁড়াইয়াছিল। পতি আসন গ্রহণ করিতেই সে তাহার সম্মুখে আসিয়া সনীর নয়নে বলিল,—"তুমি সন্ধ্যায় যাইতেছিলে কেন?

স্ত্রীর চক্ষে জল দর্শনে জহুর উদ্দিনের প্রাণে বড়ই বাজিল। তিনি প্রবোধ বাক্যে বলিলেন;—"না আজি আর যাইব না।" সফুরার নয়ন নীর বিগলিত হইয়া গণ্ড স্পর্শ করিল। সে বলিল,—"তুমি আমাকে ... ।" আর বলিতে পারিল না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে জহুর উদ্দিন ও আবদুল মতিন বিশ্বাস এক সঙ্গে নৈশভোজন সমাপন পূর্ব্বক মসজিদে যাইয়া এশার নামাজ পাঠ করিয়া আসিলেন। দক্ষিণদ্বারি ঘরের বারাণ্ডায় জহুর উদ্দিনের নিমিত্ত শয়ন-শয্যা পাতা হইয়াছিল আবদুল মতিন বিশ্বাস তাহাকে সেই শয্যায় শয়ন করিতে বলিয়া স্বীয় শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অদ্য জহুর উদ্দিনে হৃদয়ে শান্তির লেশমাত্র নাই। নানাবিধ চিন্তায় তাহার মনের গতি ভয়ানক খারাপ। দিবসের মনান্তরের কথা যখন তাহার মনে হইতেছে তখন মন এতদূর খারাপ হইয়া উঠিতেছে যে তিনি মনে করিতেছেন এখনই এ বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। পরক্ষণেই আবার দিবসের দৃষ্ট স্ত্রীর সেই সফরী সদৃশ অশ্রুভরা ডাগর ডাগর নয়ন যুগল—সেই মলিন মুখের বিষাদ ভরা চাহনী—সেই আবদার পূর্ণ করুণ বাক্য—"তুমি সন্ধ্যার সময় যাইতেছিলে কেন?" "তুমি আমাকে ···।" ইত্যাদি কথা মনে হইতেছে তখন কে যেন অলক্ষ্য হইতে তাহাকে লোহার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। ইহার মধ্যে আবার যখন বাবাজির গানের চরণগুলি তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে তখন তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিতেছেন,—"হায়! কখন যে কাহার সে দিন আসিয়া জুটে।" এইরূপ বিবিধ চিন্তায় তাহার মন খারাপ হইয়া উঠিয়াছে বিধায় কোন ক্রমেই তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না। তিনি শয়ন-শয্যায় পড়িয়া কেবল পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন।

জীবনে অনেকেই অনেক প্রকার গান শুনিয়া থাকে—সে গান হাসিবার হইলে হাসে কাঁদিবার হইলে কাঁদে এবং তাহাতে কিছু বুঝিবার থাকিলে শতকরা না হউক হাজার করা দুই একজন কিছু বুঝিয়াও থাকে; কিন্তু সে গান কতক্ষণ মনে স্থান পায়? জহুর উদ্দিন যে ইহার পূর্ব্বে কখন গান শুনেন নাই তাহা আমরা বলিতেছি না। বোধ হয় অনেক গান শুনিয়া থাকিবেন; কিন্তু যেমন শুনিয়াছেন অমনিই ভুলিয়া আসিয়াছেন। তবে বাবাজির গান তাহার মনে এত বাজিয়াছে কেন তাহা কে বলিবে?

জহুর উদ্দিন যে ঘরের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়াছিলেন সেই ঘরেই সফুরা খাতুন ও তাহার বড়ভাবী শয়ন করিয়াছিল; কিন্তু সফুরা খাতুনেরও আজি ঘুম ধরিতেছে না। কেন যে আজি তাহার ঘুম ধরিতেছে না তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় স্বামীর পার্শ্বপরিবর্ত্তনই তাহার অনিদ্রার একমাত্র কারণ।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইতেছে তবুও স্বামীর ঘুম ধরিতেছে না দেখিয়া সফুরা তাহার ভাবীর অজ্ঞাতসারে শয়ন শয্যা ত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া যাইয়া স্বামীর শয্যায় উঠিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"আজি তোমার ঘুম ধরিতেছে না কেন, কোন অসুখ করিয়াছে কি?" জহুর উদ্দিন বলিলেন,—"না অসুখ করে নাই তবে কি জানি কেন ঘুম ধরিতেছে না।" সফুরা বলিল—"না তুমি ঘুমাও কি জানি রাত্রি জাগিয়া শরীর খারাপ করিতে পারে।" এই বলিয়া স্বামীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

প্রিয়তমা পত্নীর সুকোমল কর-সংস্পর্শে জহুর উদ্দিনের মনে কতকটা শান্তি আনয়ন করিল। ক্রমে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ছেঁচা জল, যাঁচা প্রেম, ধার করা সুখ, চাহিয়া লওয়া শান্তি কতক্ষণ স্থায়ী হয়? যাহার মনে শান্তি নাই তাহার মনে শান্তি আনিয়া দেওয়া সহজ

কার্য্য নয়। সুখ শান্তি বিধাতার দান। তাহারাকে ডাকিলে আইসে না, খুঁজিলে পাওয়া যায় না। তাহারা আপন মনে আসে, নিজের ইচ্ছায় চলিয়া যায়। স্ত্রীর হাত বুলনিতে জহুর উদ্দিনের একটু নিদ্রা হইল বটে; কিন্তু অল্পক্ষণ পরই তাহা ছুটিয়া গেল।

জহুর উদ্দিন নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিলেন তখনও তাহার প্রিয়তমা পত্নী তাহার পা দু'খানি স্বীয় জানুপরি লইয়া হাত বুলাইতেছে। তিনি বলিলেন,—"একি তুমি এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়াই আছ? রাত্রি শেষ হইয়া আসিল ঘুমাও গে।" সফুরা বলিল,—"আমার ঘুমাইবার অনেক সময় আছে তুমি জাগিলে কেন ঘুমাও।"

জহুর উদ্দিন বলিলেন,—"না আর ঘুমাইব না, একটু বাহিরে যাইতে হইবে পানি আছে কি?" সফুরা উঠিয়া একটী জল পূর্ণ পাত্র আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল,—"একটু দাঁড়াও বড় আঁধার ল্যাম্প ধরাইয়া দেই।" জহুর উদ্দিন বলিলেন—"ল্যাম্প লাগিবে না।" এই বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

জহুর উদ্দিন সেই অন্ধকার রাত্রিতে বহির্ব্বাটীর দিকে চলিয়া গেলেন; কিন্তু সফুরার মন বুঝিল না সে তখনই একটা ল্যাম্প ধরাইয়া তাহার ভাবীকে জাগাইল। তাহার ভাবী জাগিয়া বলিল—"কেন এত রাত্রিতে জ্বালাতন কর।"

সফুরা বলিল,—"তিনি এই আঁধারে একাকী বাহিরের দিকে গিয়াছেন চল আমরা একটু আগে বাড়িয়া দেখি।" তাহার ভাবী রহস্য করিয়া বলিল,—"একটু কাছ ছাড়া হইয়াছে তাহাতেই এত? যাইতে হইবে না বোধ হয় বাহ্যে গিয়াছে এখনই আসিবে।" সফুরা বলিল,— "না চল একটু আগে বাড়িয়া দেখি।" এই বলিয়া তাহার ভাবীর হাতে ল্যাম্প দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহারা বহির্বাটীর প্রাঙ্গন পার হইয়া ঘাই ঘরার নিকট আসিয়াছে এই সময় অদূরে জহুর উদ্দিন কণ্ঠ পরিষ্কার করিরার শব্দ করিলেন৷ তাহার এই কণ্ঠ পরিস্কার ধ্বনিতে তাহারা বুঝিল তিনি বাটীর দিকে ফিরিতেছেন বিধায় তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া বাটীর দিকে ফিরিল।

ল্যাম্প ধারিণী অন্দর মুখি হইয়া একটু আগে বাড়িয়া গিয়াছিল এবং সফুরা স্বামীর অপেক্ষায় তাহা হইতে অনুমান ১০।১২ হাত পাছে হইয়া একবার স্বামীর দিকে একবার ল্যাম্প ধারিণীর দিকে চাহিতে চাহিতে যাইতেছিল; কিন্তু অদৃষ্ট ফলে—যাইতে যাইতে আলোক আঁধারে একখানা ঘাইরের জ্বালানী কাষ্ঠে উঝট্ খাইয়া মুখের ভরে পড়িয়া গেল।

আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা রমণী উঝট্ খাইয়া মুখের ভরে পড়িয়া যাওয়া ব্যাপার সহজ নহে। সফুরা পড়িয়া যাইবার সময় "ইন্নালিল্লা" বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহার এই বাক্য উচ্চারণে ও পড়িয়া যাইবার শব্দে তাহার ভাবী হাতের ল্যাম্প ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া "হায় আল্লা কি হইল।" বলিয়া তাহাকে উঠাইবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা! তখন তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত—ডাগর চক্ষু রক্তিম এবং উর্দ্ধে।

এদিকে "কি হইল" বলিয়া জহুর উদ্দিন দৌড়িয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনিও হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাহাদের এই গোলমালে বাটীর সকলই জাগরিত হইয়া ছুটিয়া আসিল। অতঃপর কোনরূপ ধরাধরি করিয়া সফুরাকে বাটী লইয়া যাওয়া হইল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এক দুই করিয়া যামিনীর যামত্রয় অতীত হইয়া ঊষার আগমন অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপিও সফুরার লুপ্ত সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই। বাটীর সকলই প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতেছে। তাহার জননী পার্শ্বে বসিয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতেছেন। জহুর উদ্দিন চক্ষের জল চক্ষে চাপিয়াই বাতাস করিতেছেন। কিন্তু সফুরা নড়া চড়া পর্য্যন্ত করিতেছে না।

সময় কারু মুখের প্রতি চাহে না সে আপন মনে আপন গতিতে চলিয়া যায়। ক্রমে একটু বেলা হইলে সফুরা একটু নড়িয়া উঠিল। তৎপর আরও একটু সময় কাটিয়া গেলে সে বক্ষে হস্ত দিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল "উহুঃ! প্রাণ যায়।" এবার আরও জোরে শুশ্রূষা চলিতে লাগিল তাহার ফলে আরও কিছুক্ষণ পর সফুরা চক্ষু মেলিয়া ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিল। জননী মুখের কাছে মুখ দিয়া বলিলেন,—"মা কলেজার টুক্‌রা আমার তোর কেমন বোধ হইতেছে?" সফুরা উদরোপরি হাত দিয়া উত্তর প্রদান করিল।

আরও দুই দিন কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই দিন ধরিয়া পূর্ণমাত্রায় শুশ্রূষা চলিতেছে। চিকিৎসায় জলের মত অজস্র অর্থব্যয় করা হইতেছে। তাহার প্রাণ রক্ষাহেতু কত সাদকা করা হইতেছে; কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না অবস্থা ক্রমশঃই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে। এই দুই দিন ধরিয়া সে মনের একটা কথাও বলিতে পারে নাই তবে কেবলমাত্র এক একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিতেছে।

তাহার এই সাংঘাতিক অবস্থায় বাটীর প্রাণীবর্গের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝান যায় না এমন কি পাড়া প্রতিবেশীদের চক্ষেও জল দেখা যাইতেছে এবং সকলেই কায়মনবাক্যে খোদার দরগায় তাহার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে; কিন্তু কাহার দ্বারাই কোন উপকার হইতেছে না। হায়রে মায়াময় দুনিয়া! হায়রে পার্থিব ভালবাসা! তোমাদের মূল্য কত? যাহার কপাল মন্দ তাহার ভাল কে করিতে পারে?

আরও একদিন কাটিয়া গিয়াছে। অদ্য তৃতীয় দিবসে সফুরার অবস্থা বড়ই শঙ্কাজনক। সকলেই তাহার প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াছে। প্রিয় পাঠক পাঠিকা! ঐ দেখুন সফুরা আসন্ন মৃত্যু শয্যায় শায়িতা। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রমশঃ রোধ হইয়া আসিতেছে। তাহার প্রাণাধিক পতি শয্যা পার্শ্বে বসিয়া নয়ন জলে বুক ভাসাইয়া বাতাস করিতেছেন। বাটীর সকলে ঘেরিয়া যাহার মনে যাহা আসিতেছে তাহাই বলিয়া রোদন করিতেছে। সফুরার সংজ্ঞা এক একবার বিলুপ্ত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার কাতরাণী দেখিয়া সকলেরই বুক ফাটিয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় সমস্ত দিন কাটিয়া গেল মাত্র এক প্রহর বাকী।

এই সময় সফুরার সংজ্ঞা ঠিক বলিয়া বোধ হইল। সে হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া সকলের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"তোমরা কাঁদিও না আমি মরিব না—খোদার নামে ভরসা কর।" তৎপর স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার নয়ননীর মুছাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার সে শক্তি কোথায়? হাতখানা তুলিতে ইচ্ছা করিয়াও তুলিতে পারিল না। তাহার সংজ্ঞা ঠিক দেখিয়া সকলে মনে করিল—বোধ হয় এ যাত্রায় রক্ষা পাইল।

সফুরার সংজ্ঞা ঠিক হইয়াছে তাহা আরোগ্যের লক্ষণ না মৃত্যুর নিদর্শন তাহা কে বলিতে পারে? সফুরা সেই অবস্থাতেই আবার তাহার জননীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"মা আমি তোমার বড়ই দুঃখিনী মেয়ে,

তুমি আমাকে কত দুগ্ধ পান করাইয়া কত শরীরের রক্ত পানি করিয়া মানুষ করিয়াছিলে; কিন্তু আমি সে সকলের ধার কিছুই, শোধ করিতে পারিলাম না। মা, বোধ হয় জীবনে কুলাইল না। তোমার চিরদুঃখিনী মেয়েকে ক্ষমা কর মা, আমার! তোমাকে জন্মের মত এই বোধ হয় শেষ 'মা' বলিয়া ডাকিলাম আর ডাকিতে পারি কিনা।"

জননীর হৃদয় ফাটিয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি মেয়ের মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"তোকে ক্ষমা করিলাম চিরদুঃখিনী মা আমার! তুই অভাগী মাকে ছাড়িয়া কোথায় যাস্? কেন আমাকে আর 'মা' বলিয়া ডাকিবি না? বড় আশা করে যে তোকে মানুষ করেছিলাম। আমার জহুরকে কোথায় ভাসাবি মা!"

সফুরা বলিল,—"চিন্তা নাই এক দমে হাজার দম। খোদা আছেন কাঁদিও না। আমার ভালবাসা রাহেলাকে দিও তাকে চক্ষে চক্ষে দেখিও তাহার শিক্ষার বিষয় চেষ্টা রাখিও।" তৎপর রাহেলাকে হাতে ধরিয়া বলিল,—"রাহেলা! কাঁদিস না আমি মরিব না।" রাহেলা আরও উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল।

অতঃপর বাটীর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।" ঘরে অনুচ্চরবে কান্নার রোল উঠিল। সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা করিলেন। আবদুল মতিন বিশ্বাসের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"স্নেহের বোন আমার। তুই কোথায় যাইতেছিস? বড় আশা করিয়া যে তোর নিকা দিয়াছিলাম!" সফুরা কপালে হাত দিয়া দেখাইল।

সফুরা এ সময় যেমন ভাবে কথা বলিতেছে তাহাতে কেহই বলিতে পারিবে না যে, তাহার দেহে কোন প্রকার পীড়া আছে। সফুরা আর কোন কথা না বলিয়া নীরব হইল এবং একটু নীরব থাকিয়া আবার

বলিল,—"তোমরা আমাকে আর কেহ কিছু বলিও না—আমার যেন ঘুমাইবার ইচ্ছা হইতেছে।" এই বলিয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলের মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। কেহ কেহ বলিল "বোধ হয় বাঁচিতে পারে।" অতঃপর সফুরার জননী ও জহুর উদ্দিন ব্যতীত সকলেই দুই এক করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরই সফুরা চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"না না হইল না—পারিলাম না—আমাকে একবার উঠাইয়া বসাও।" জহুর উদ্দিন বলিল,—"তুমি কি এ অবস্থায় বসিতে পারিবে?" সফুরা বলিল,—"পারিব বড় সাধ একবার তোমার বুকে মাথা দিয়া আরাম করিব—তুমি আমার সাধটী পূর্ণ কর।"

জহুর উদ্দিন আর বাক্য ব্যয় না করিয়া তাহাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে বসাইয়া মস্তকটী স্বীয় বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন; কিন্তু সফুরা সেখানে মস্তক রক্ষা করিতে না পারিয়া বলিল,—"না পারিলাম না—আমার মাথাটী তোমার ঘাড়ের উপর রক্ষা কর।" জহুর উদ্দিন তাহার মস্তক সরাইয়া স্বীয় স্কন্ধোপরি স্থাপন করিলেন। সফুরা বলিল,—"ছাড়িয়া দাও এবার বেশ আরাম বোধ হইতেছে—আমার অন্তিম সাধ পূর্ণ হইল।" এই বলিয়া কষ্টে স্পষ্টে হাত তুলিয়া স্বামীর মুখে বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—"হে রহমান রহিম খোদা! আমার ফেরেস্তার মত স্বামী—তুমি রহমতের নজরে দেখিও।" জহুর উদ্দিনের চক্ষু পূরিয়া হুহু করিয়া জল আসিল। তিনি বলিলেন,—"তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছ?"

সফুরা বলিল,—"আল্লা আছেন—সকলকেই মরিতে হইবে। আমি তোমার কত নাফরমানী করিয়াছি—বোধ হয় কত কষ্টও দিয়াছি সব ক্ষমা কর।" জহুর উদ্দিনের বুক ভাঙ্গিয়া গেল;—তিনি বলিলেন,—"খোদা রক্ষা করুন, আমি ক্ষমা করিলাম।"

চক্ষের জলে জহুর উদ্দিনের বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সফুরা আবার বলিল,—"তুমি এ সময় কাঁদিও না—একবার কোরআন পড়িয়া আমাকে শুনাও।" জহুর উদ্দিন 'সুরে ইয়াশিন' পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অল্পই পড়িয়াছেন ইতোমধ্য সফুরা চম্‌কিয়া বলিল,—"আল্লাহো-আকবার! কি ভয়ানক চেহেরা! তুমি আমাকে বুকে চাপিয়া ধর! মা—মা—পানি—পানি।" তাহার জননী মুখে সরবৎ দিলেন।

সফুরা বলিল,—"আর বাঁচিব না, শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে। সব থাকিল দেখিও—আমাকে ভুলিও না। দোওয়া করিও, কোরআন পড়িয়া বক্‌সিও। কিয়ামতের দি—ন—দে—খা—এই গেলা—ম—বুক—ভা—রী—হ—ই—লাএলাহা ইল্লিল্লা।"

জহুর উদ্দিন উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"সোনার সফুরা তুমি কোথায় গেলে!" তাহার জননী বুকে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাটীর যে যেখানে ছিল সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সকলেই দেখিতে পাইল—সফুরার দেহ ভার ক্রমশঃ শিথিল হইয়া ধীরে ধীরে হালিয়া পড়িল। উপস্থিত সকলে বুক ফাটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জহুর উদ্দিন মৃত দেহখানি ধীরে ধীরে শয্যায় রক্ষা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

হাজার বুক ফাটাইয়া—প্রাণ ফাটাইয়া কাঁদ কিন্তু যে মরিয়াছে তাহাকে আর ফিরাইতে পারিবে না। যে পাখীটী পিঞ্জর হইতে উড়িয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। হাজার হৃদয়ের হৃদয় মণি—বুকের বুক ভরা ধন—চক্ষের পুত্তলী—আঁধারে আলো হইলেও প্রাণে ধরিয়া—হাতে করিয়া সেই নির্জ্জন স্থানে ঘোর অন্ধকার সমাধিগর্ভে তাহাকে একেলাটী ফেলিয়া আসিতে হয়। মৃত দেহের সৎক্রিয়ার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ভগ্নীর অকাল মৃত্যুতে আবদুল মতিন বিশ্বাসের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও তিনি কাফন, দাফনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জহুর উদ্দিন তাহার প্রাণ প্রতিমাকে অন্য কাহাকেও গোসল দিতে না দিয়া স্বহস্তেই গোসল দিয়া কাফন পরাইয়া তাহাতে নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য মাখাইয়া কিয়ামতের যাত্রী সাজাইলেন।

অতঃপর একখানা খাটে সুকোমল শয্যা রচনা পূর্ব্বক তাহাতে মৃত দেহ তুলিয়া গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হইল। তৎপর জানাজার নামাজ পাঠ করিয়া লাস (শব) প্রেথিত করিবার নিমিত্ত গোরের নিকট ধরা হইল। আবদুল মতিন বিশ্বাস ও জহুর উদ্দিন গোরে নামিয়া ধরাধরি করিয়া লাস গোরে নামাইয়া দিলেন। আজি সফুরা খাতুন জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন করিয়া অনন্ত জগৎ হইতে শঙ্কীর্ণ সমাধির বিস্মৃতি গর্ভে স্থান অধিকার করিল। হায়রে ভবের লীলা! হায়রে মানব জীবনের নশ্বরতা! হায়রে সরলা, সুশীলা, ধার্ম্মিকা, প্রেমিকা "সফুরার পরিণাম।"

মৃতদেহ গোরে রাখিয়া আবদুল মতিন বিশ্বাস উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু জহুর উদ্দিন আর উঠিতেছেন না, তিনি একদৃষ্টে লাসের প্রতি চাহিয়া পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় অতীত হইয়া গেল তথাপিও তিনি উঠিলেন না দেখিয়া জনৈক লোক বলিলেন,—"আর বিলম্ব করিবেন না—উঠিয়া আসুন।" লোকটীর কথা বোধ হয় জহুর উদ্দিনের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতে পারিল না তাই আবার আবদুল মতিন বিশ্বাস বলিলেন,—বিলম্ব হইতেছে আপনি সত্বর উঠিয়া আসুন।"

এইবার জহুর উদ্দিনের চমক ভাঙ্গিল, তিনি বলিলেন,—"আমি কোথায় আছি?" গতিক খারাপ দেখিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উপরে তুলিয়া মৃতদেহ প্রোথিত করিয়া দেওয়া হইল।

দফন ক্রিয়া শেষ করিয়া সকলে বাটী ফিরিল। জহুর উদ্দিন উন্মাদের ন্যায় আসিয়া আবদুল মতিন বিশ্বাসের বৈঠক ঘরে বসিলেন। তখন রাত্রি প্রায় নয়টা।

উপসংহার।

---:o:---

পর দিবস জহুর উদ্দিন বাটী যাইবার নিমিত্ত লক্ষ্মীপুর ত্যাগ করিয়া ইংরাজ বাজার পৌঁছিলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া বিশ্রাম হেতু একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িলেন। তখন বৈকাল বেলা। ইংরাজ বাজার লোকে লোকারণ্য। কত গাড়ী, ঘোড়া ছুটাছুটি করিতেছে। কত বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী ইত্যাদি নানা দেশের নানা রকমের লোক স্ব স্ব কার্য্যে গমনাগমন করিতেছে। জহুর উদ্দিন উদাস দৃষ্টিতে সে সকলের প্রতি চাহিয়া মনে মনে বলিলেল,—"হায়! দুনিয়ায় এত লোক আছে কিন্তু একটী লোক নাই কেন? তাহাকে কি আর পাওয়া যাইবে না?"

তিনি সেইস্থানে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই তপনদেব অস্তমিত হইলেন। ক্রমে ধরা বক্ষ অন্ধকার হইয়া আসিল। তিনি সেই অন্ধকারে বরাবর ষ্টেশন যাইয়া টিকিট ক্রয় করতঃ রাত্রি বারটার গাড়ীতে চাপিয়া রাত্রি চারিটার সময় একলক্ষ্মী ষ্টেশনে নামিলেন।

তখন শেষ নিশার মৃদুল পবন ধীরে ধীরে বহিয়া বহিয়া উষার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। জহুর উদ্দিন গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পশ্চিম মুখে রেল লাইন ধরিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যখন মহারাজপুরের সেতুর উপর দিয়া মহানন্দানদী পার হইতেছিলেন সেই সময় শুনিতে পাইলেন জনৈক নাবিক নৌকা বাহিতে বাহিতে গাহিতেছিল;—

"জারা মিঠি বোল শুনাকে কিধার গিয়ারে
আরে হিরামণ তোতা !
উড় গিয়া পুড় গিয়া কি নাদয়ামে ডুব গিয়ারে
আরে হিরামণ তোতা !"

এই গানটী শ্রবণমাত্রই তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি পড়িয়া যাইতে যাইতে পার্শ্বের একখানা রেল্ ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন,—"নাবিক ! তুমি আমারই গাঁথা গাহিতেছ !" হায়রে প্রণয়ী বিয়োগ !

অতঃপর তিনি সম্পুর্ণ শোক সামলাইয়া বাটীর পথে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া স্বর্য্যোদয় কালে বাটী পৌঁহচিলেন।

তিনি বাটীতে পৌঁহচিতেই তাহার জননী ভাঙ্গিয়া আসিয়া বলিলেন ;— "বাবা, লক্ষীপুর হইতে আসিলে—এত বিলম্ব হইল কেন? খবর কি বৌ ভাল আছে ত ?

মরার উপর খাঁড়ার ঘা। জহুর উদ্দিনের হৃদয় চড়্‌চড়্‌ করিয়া চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। তিনি ফিঁক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"মা সে সোণার সফুরা গোরে—বিগত কল্য তাহার জীবন নাট্যের শেষাঙ্কে সমাধি—।"

সমাপ্ত